বিশাখা

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

দেবনাথ বললো, তুমি তা হলে এখন কোন্ দিকে যাবে? সাউথের দিকে ফিরবে নাকি?

আমি বললাম, না ভাই! আমি একটু কলেজ স্ট্রীট ঘুরে যাবো ভাবছি। দেবনাথ হাতার বোতাম খুলে ফেলে সার্ট সরিয়ে সাবধানে ঘড়ি দেখলো। তারপর বললো, সাড়ে সাতটা তো বাজলো! এখন আর কলেজ স্ট্রীটে গিয়ে কি করবে?

আমি মনে মনে ভাবলুম, দেবনাথ কি প্রত্যেকবারই ঘড়ি দেখবার জন্য সার্টের হাতার বোতাম খোলে! তা হলে বোতাম আটকানোর কি দরকার? অথবা ঘড়ি না পরলেই হয়!

বললাম, এই একটু এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করে যাবো!

—কে বন্ধু?

—আছে একজন, তুমি চিনবে না!

—আমিও তো তোমার বন্ধু। আজ না হয় আমার বাড়িতেই যেতে—একটু চা খেয়ে তারপর ফিরতে!

—আজ নয় ভাই, আর একদিন যাবো!

—তুমি আর গেছো! যেদিনই দেখা হয়, তোমার শুধু ঐ এক কথা। গেলে না তো একদিন ও। বিশাখা প্রায়ই তোমার কথা জিজ্ঞেস করে।

আমি কয়েক মুহূর্ত অন্যমনস্ক হবার সুযোগ নেবার জন্য পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করতে লাগলুম। একটা ডবল্‌ডেকার একেবারে ফুটপাত ঘেঁষে আসছে। আমরা দুজনেই সরে দাঁড়ালুম। প্যাকেটটা দেনবাথের দিকে এগিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলুম সে খাবে কিনা। যেন কোনই ইচ্ছে নেই, নেহাৎ উপরোধে ঢেঁকি গিলছে এই ভাবে দেবনাথ বললে, দাও একটা!

আমি নিজের সিগারেটটা ধরিয়ে আরাম করে এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে জিজ্ঞেস করলাম, বিশাখা কেমন আছে?

—ভালোই আছে। তবে বড্ড একা একা থাকে। তোমরা মাঝে মাঝে গেলে-টেলে—

—আচ্ছা ভাই চলি আজ, আবার পরে দেখা হবে।

—তুমি তা হলে কলেজ স্ট্রীটেই যাবে? আমার সঙ্গে যেতে চাও না?

—না, না, তোমার সঙ্গে গেলে তো ভালোই হতো! কিন্তু কলেজ স্ট্রীটে একটা বিশেষ কাজ আছে।

—তা হলে এসো কিন্তু একদিন বাড়িতে। কবে আসবে? কাল? পরশু? আমি তা হলে বিশাখাকে বলবো—

—না, কাল পরশু হবে না—এই মাসটা একটু ব্যস্ত আছি। চলে যাবো যে-কোনো একদিন।

রাস্তা পার হয়ে ওপাশে গিয়ে আমি ষড়যন্ত্রকারীর মতন আড়চোখে দেবনাথকে দেখতে লাগলুম। আমার এখন দক্ষিণ কলকাতাতেই ফেরা দরকার যদিও, কিন্তু দেবনাথের সঙ্গে এক সঙ্গে যেতে চাই না। রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধরে কথা বলেছি দেবনাথের সঙ্গে, বাকি পথটাও ওর বক্‌বক শোনার ইচ্ছে আমার নেই। তাছাড়া দেবনাথ কতকগুলো অদ্ভুত ব্যবহার করে। আমি দিচ্ছি, আমি দিচ্ছি বলে পকেটে হাত ভরে কণ্ডাকটরের সামনে টিকিট কাটার জন্য পেড়াপিড়ি করে। আমি যদি ভদ্রতা করে একবার মাত্র বলি, না, না, আমিই দিই না—ব্যস্‌, দেবনাথ আর পকেট থেকে হাত বার করবে না। আমার টিকিট কাটা থেকে খুচরো পয়সা ফেরৎ নেওয়া পর্যন্ত সরু চোখে তাকিয়ে থাকবে, তারপর উল্টো চাপ দেবে আমাকেই। অনুযোগের সুরে বলবে, কেন, আমি টিকিট কাটলে বুঝি তোমার মানে লাগতো? আমি কি একদিনও টিকিট কাটতে পারি না! না হয় আমি এখন.....

সামান্য দু'চার আনা পয়সার জন্য এসব কথা শুনতে কার ভালো লাগে? এর আগে দু'দিন আমার এ-রকম অভিজ্ঞতা হয়েছে। অথচ বছর দুয়েক আগেও দেবনাথ নিজের গাড়িতে ঘুরে বেড়াতো। যখন তখন গাড়ি থামিয়ে লিফ্‌ট দিতে চাইতো আমাদের।

আমি লক্ষ্য রাখতে লাগলুম, দেবনাথ বাসে উঠে পড়েছে কিনা! ও চলে গেলে আবার আমাকে রাস্তা পেরিয়ে ওদিককার বাস ধরতে হবে। কে জানে, দেবনাথও হয়তো নজর রেখেছে, আমি সত্যিই কলেজ স্ট্রীটের বাসে উঠি কিনা। চুপচাপ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে দেবনাথ, সিগারেটটা পুরো শেষ করার আগে যে সে বাসে উঠবে না, এতো জানা কথাই!

সম্পূর্ণ পরাজিত মানুষের সংসর্গ আমার ভালো লাগে না। দেবনাথকে দেখলেই মনে হয়, ওর ভেতরটা একেবারে মরে গেছে, বেঁচে আছে শুধু ওর

পঞ্চভূতের শরীরটা। সমস্ত পৃথিবীর বিরুদ্ধে ওর শুধু অনুযোগ আর অভিমান। বেঁচে থেকে আর কি হবে, এই ধরনের একটা ভাব নিয়ে দেবনাথ বেঁচে আছে। এর থেকে তো মরে গেলেও পারে? আমি যদি দেবনাথকে খুন করি, তাহলে হত্যাকারী হিসেবে আমার শাস্তি হবে, কিন্তু মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা দেওয়া কি অপরাধ?

দেবনাথের মুখোমুখি পড়ে গেলেই আমার অস্বস্তি হয়। অথচ অভদ্রভাবে এড়িয়ে যেতেও পারি না। এক সময় সুন্দর চেহারা ছিল দেবনাথের, ফর্সা, লম্বা ঋজু শরীর, তীক্ষ্ণ নাক—এখনও সব ঠিক-ঠাক আছে, কিন্তু মুখে এক ধরনের শিরশিরে হতাশা। এইসব মুখ অন্য মানুষের মধ্যে দারুণ প্রভাব ফেলে। দেবনাথের মতন লোকদেরও সমাজের বাইরে বার করে দেওয়া উচিত। বিশাখার জন্য আমার দুঃখ হয়। কিন্তু আমি ওকে কি সাহায্য করতে পারি? বিশাখা তুমি নিজেই তো এ-জীবন বেছে নিয়েছো।

আমি জয়ী নেই, কিন্তু সম্পূর্ণ পরাজিতও নই। কখনও খুব মন খারাপ থাকে, মনে হয়, জিভে একটা নিমপাতা লাগানো, চোখের সামনে সব কিছুই ম্যাটমেটে। আবার কখনও সামান্য একটু ফুরফুরে হাওয়া দিলেই, এবং পকেট যদি নিতান্ত খালি না থাকে, তখন মনে হয়, আঃ বেঁচে থাকাটা কি চমৎকার ব্যাপার! কি সৌভাগ্যে এই মানুষের জন্মটা পেয়েছি! মানুষ হয়ে না জন্মালে কি টের পেতাম, বিকেল ও সন্ধেবেলার সন্ধিক্ষণে একটা অদ্ভুত আলো দেয়, সেই আলোতে বড় রহস্যময় মনে হয় এই জীবনটা। এই আলোয় ঝানু পাত্রীপক্ষরা মেয়ে দেখায়, জলের রং পর্যন্ত বদলে যায় এই আলোয়—এই রকমই এক ঠাণ্ডা আলোর মধ্যে আমি একটি নারীর পাশে বসে দেখে ছিলাম, পুকুরের জল দু'ভাগ করে সাঁতরে আসছে একটা সাদা হাঁস। মন ভালো থাকার মুহূর্তে প্রায়ই আমার সেই সাদা হাঁসটার কথা মনে পড়ে।

আর, এইরকম সময়েই কোথা থেকে যেন দেবনাথ এসে উদয় হয় আমার সামনে। বিমর্ষ মুখে একটু হাসির প্রেত দেখিয়ে বলে, এই যে, ইয়ে, সুনীল, কোথায় চললে? চলো না, আমার বাড়িতে একটু চা-টা খেয়ে যাবে! বিশাখা বলছিল....কি বিশ্রী ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে—চারদিকে ইনফ্লুয়েঞ্জা হচ্ছে এখন!—একদিন একটা ডবল্ ডেকারের সামনে দেবনাথকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিলে কি হয়?

উঁকি মেরে দেখলুম রাস্তার ওপাশে দেবনাথ নেই। তবু সাবধানের মার নেই, ভালো করে চার পাশ খুঁজে নিলুম। না, দেবনাথ সত্যিই চলে গেছে।

রাস্তা পেরিয়ে এসে আমি পরবর্তী বাসে উঠে পড়লুম, এবং সৌভাগ্যবশত প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দু'জন লোক নেমে যেতেই জানালার ধারে একটা বসবার জায়গা পেয়ে গেলুম।

চারটে স্টপও যেতে হলো না। হৈ-হৈ করে একদল লোক থামালো। সন্ধে পৌনে আটটায় সাধারণত ছাত্র আন্দোলন হয় না, প্রথমে ভেবেছিলাম কোনো লোক চাপা পড়েছে, কিংবা দুই পার্টির দাঙ্গা হলেও হতে পারে। কিন্তু ব্যাপারটা তার চেয়ে অনেক নিরীহ, আগের একটা বাস ব্রেক-ডাউন. তার সব যাত্রীরা এই বাসে উঠবে। জানালা দিয়ে দেখলুম, যে সব লোক ওঠার জন্য ছোটাছুটি করছে, তাদের মধ্যে আর কে, দেবনাথ!

আমি একেবারে মরমে মরে গেলুম। আমাকে লজ্জায় ফেলার জন্য এটা একটা নিয়তির চক্রান্ত ছাড়া আর কি! কোনো সন্দেহ নেই, দেবনাথ ঠিক দোতলায় উঠে আসবে, আমাকে দেখতে পাবেই, একটুও না হেসে বলবে কি, কলেজ স্ট্রীট গেলে না তাহলে। আমি যেন চোর ধরা পড়েছি! দেবনাথ নিজেই তো একটা চোর, শুধু চোর নয়, একটা মিটমিটে বদমাস! অথচ এখন আমাকেই ও প্যাঁচে ফেলবে। কেন, আমার কি হঠাৎ মত পাল্টাবার উপায় নেই? কলেজ স্ট্রীট যাবো ভেবেও রাসবিহারী এভিনিউ-র দিকে কি যেতে পারি না? আমি আমার যা খুশি করবো!

তবু আমি মুখ লুকিয়ে বসে রইলুম। বাসে বেশ ভিড় হয়ে গেছে, এখন আমাকে দেখতে না-পাবার একটা ক্ষীণ সম্ভাবনা আছে। আমি নামবো দেবনাথের বাড়ি ছাড়িয়ে অনেক দূরে। খুব মনোযোগ দিয়ে আমি দেখতে লাগলুম রাস্তার দোকানের বিজ্ঞাপনগুলো।

আমার পাশের লোকটি উঠে যেতেই আমার গা কিরকির করতে লাগলো। জানি এখানে দেবনাথ এসে বসবেই। আমি একেবারে নিশ্বাস বন্ধ করে প্রতীক্ষা করতে লাগলুম। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখার পর্যন্ত সাহস নেই। দেবনাথ না, একজন মোটা মতন লোক এসে বসলো। তাও নিশ্চিন্ত হতে পারলুম না। শেষ পর্যন্ত যা ভেবেছিলাম, তা-ই হলো। একটু বাদেই পেছনের সিট থেকে দেবনাথ আমার পাশের লোকটিকে বললো, দাদা, আপনি একটু এখানে এসে বসবেন? আমি আমার বন্ধুর সঙ্গে একটু কথা বলবো!

বন্ধু না কচু! এক্ষুণি এক ঘুষিতে তোমার মাথার খুলি উড়িয়ে দিতে পারলে আমি খুশী হতুম!

আমি হেসে কৈফিয়ৎ দেবার সুরে বললাম, কলেজ স্ট্রীটের বাসে যা ভিড়, তাই আর যাওয়া হলো না! যেন আমাকে দয়া করছে, এই ভঙ্গিতে দেবনাথ বললো, হ্যাঁ, বাসে বিশ্রী ভিড় তো লেগেই আছে! ট্যাক্সিও পাওয়া যায় না! কলকাতার যা অবস্থা হচ্ছে দিনদিন।

সেই মুহূর্তে কলকাতা সম্পর্কে কোনো অভিযোগ অবশ্য আমার মনে ছিল না, কিন্তু দেবনাথের সঙ্গে মত মেলাতেই হলো। কিছুদিন আগেও দেবনাথের একটা গাড়ি ছিল, তখন অবশ্য ট্রাম বাসের ভিড় সম্পর্কে ওর কোনো মন্তব্য শোনা যেত না।

দেবনাথ জিজ্ঞেস করলো, তাহলে এখন কোথায় যাবে? বাড়ি ফিরবে, না কোনো বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আড্ডা দিতে যাবে?

এ কথাটার মধ্যেও খোঁচা আছে। দেবনাথ বোঝাতে চাইছে, আমার অনেক বন্ধুবান্ধব আছে, ওর কোনো বন্ধু নেই। আর, দেবনাথ আমার সঙ্গে চার বছর কলেজে পড়লেও, আমি বন্ধু হিসেবে আড্ডা দিতে চাই না ওর সঙ্গে।

বললাম, না, বাড়ির দিকেই যাবো ভাবছি। তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়বো আজ।

—চলো না, আমার ওখানে। এক কাপ চা খেয়ে যাবে। বিশাখা বলছিল....

—আর একদিন তো যাবো বলেছিই। আজ নয়।

—তুমি তো কলেজ স্ট্রীটে যাচ্ছিলেই। সেখান থেকে তো ন'টা সাড়ে ন'টার আগে ফিরতে পারতে না?

আর কতবার না বলতে পারে মানুষ! আমার বিরক্তি একেবারে শেষ সীমায় পৌঁছেছে। ইডিয়েটটা কি বুঝতে পারে না যে আমি বিশাখার সঙ্গে দেখা করতে চাই না। যাকে দেখেছিলাম এক সময় অহংকারী দেবীর মতন, এখন তার মহিমা-বর্জিতা মূর্তি আমার দেখার ইচ্ছে নেই একটুও!

শেষ চেষ্টা করে বললাম, তার চেয়ে তুমিই চলো না আমার বাড়িতে। ওখানেই চা-টা খাবে। তুমি তো আমার বাড়িতে যাওনি কখনো!

—না ভাই, তা হয় না! বিশাখা একা একা থাকবে। তুমিই চলো না—তুমি তো আর বিয়ে করোনি, এই তো কাজেই—

—ভাবছিলুম, আজ একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে....

—আমার বাড়িতে যেতে যদি তোমার কোনো আপত্তি থাকে, তাহলে অবশ্য জোর করবো না।

—না, না, তা নয়। ঠিক আছে, চলো—

ভদ্রতার এই তো অসুবিধে, মুখের ওপর সত্যিকথা বলা যায় না। হাজরা মোড়ের এক স্টপ আগে উঠে দাঁড়ালো দেবনাথ, ডাকলো না, শুধু তাকালো আমার দিকে। আমিও উঠে পড়লুম।

আগে ফর্সা উজ্জ্বল চেহারা ছিল দেবনাথের, এখন মুখখানা মনে হয় রক্তশূন্য। তবু তার লম্বা ছিপছিপে চেহারাটা দেখে মেয়েরা সুপুরুষই বলবে। দেবনাথ কি এখনও আবার নতুন ভাবে জীবনটা শুরু করতে পারে না?

বাস থেকে নামার পর দেবনাথ বললো, দেখলে, একটা লোক কি রকম ইচ্ছে করে আমার পা মাড়িয়ে দিলে!

আমি মৃদু প্রতিবাদ করে বললাম, ইচ্ছে করে কি আর দিয়েছে? ভিড়ের মধ্যে দেখতে পায়নি নিশ্চয়ই।

—না, না, এক টাইপের লোক আছে তারা ইচ্ছে করে অন্যদের পা মাড়িয়ে দিয়ে আনন্দ পায়। আমার এরকম প্রায়ই হয়।

আর কিছু বললুম না। যদিও বা সেই ধরনের লোক থাকে তারা কিন্তু এ পর্যন্ত কোনোদিন আমার পা মাড়িয়ে দেয়নি। তারা ঠিক ভিড়ের মধ্যে দেবনাথের পা খুঁজে বার করে।

দেবনাথের বাড়ির রকে চার-পাঁচজন ভিখিরি শুয়ে-বসে আছে। দেবনাথ একেবারে খেঁকিয়ে উঠলো, এই, যা, যা এখান থেকে! যত সব!

ভিখিরিরা আড়মোড়া ভাঙছে, সহজে যাবে না। দেবনাথ চাকরের নাম ধরে চেঁচাতে লাগলো, দামু, দামু! আবার এগুলোকে এখানে বসতে দিয়েছিস্!

এক বছরে মানুষ কত বদলে যায়। দেবনাথের গলার এই রুক্ষতা আগে কখনো শুনিনি। ভিখিরিরা রক নোংরা করে ঠিকই, কিন্তু পাড়ার ছেলেরা ওখানে নোংরা কথার ফোয়ারা ছোটালে দেবনাথ কি ওরকম কেঁকিয়ে উঠতে পারতো?

দরজা খোলার পর সিঁড়িতে পা দিয়েই আমার মনে হলো, ভদ্রতা রক্ষার জন্য মানুষ কত অসহায়! আমি কেন এখানে এসেছি? আমার তো

দেবনাথকে বলা উচিত ছিল, তুই একটা চোর, ঘুষখোর, ঘৃণাজীব। সামাজিক ভাবেই তো তোর সঙ্গে আর কারুর মেশা উচিত নয়! তোর বাড়িতে আসা তো দূরের কথা, তোর সঙ্গে আমার কথা বলাই উচিত নয়!—কিন্তু এসব কথা কিছুতেই মুখ ফুটে বলতে পারি না! মুখ তুলে দেখলাম, সিঁড়ির ঠিক মাথায় বিশাখা দাঁড়িয়ে আছে। দূর থেকে এখনো তাকে ঠিক দেবী মূর্তির মতনই দেখায়।

বছর তিনেক আগে একবার এসেছিলাম দেবনাথদের বাড়িতে। তখন এ বাড়ির দামী দামী আসবাব দেখে চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল। এখনও সেইসব জিনিসই আছে, কিন্তু একটা কেমন যেন অগোছালো ভাব। এক সময় দারুণ ঘর সাজাবার বাতিক ছিল বিশাখার।

লিণ্ডসে স্ট্রীটের মুখে বেশ কিছুদিন আগে একবার দেখা হয়েছিল বিশাখার সঙ্গে, সেদিন বিশাখা শুধু পর্দার কাপড়ের চিন্তায় উদ্বিগ্ন। মেরুণ রঙের একটা বিশেষ সেডের পর্দার কাপড় নাকি সারা দক্ষিণ কলকাতায় কোথাও পাওয়া যায়নি, তাই নিউ-মার্কেটে খুঁজতে গিয়েছিল। জানলায় এখনও রয়েছে সেই চাপা মেরুণ রঙের পর্দা—সোফার রঙের সঙ্গে মিলিয়ে, কিন্তু অনেকদিন সোফার ধুলো ঝাড়া হয়নি ভালো করে। মাঝখানের টেবিলটা বসানো রয়েছে বাঁকা ভাবে।

দেবনাথ বললো, নিয়ে এলাম সুনীলকে ধরে!

বিশাখা বললো, কেমন আছো? অনেকদিন পর দেখলাম তোমাকে। মাসীমা কেমন আছেন?

বিশাখা তো আগে আমাকে আপনি বলতো। আজ হঠাৎ তুমি বলার কারণটা বুঝলাম না। হয়তো, অনেকদিন দেখা না হওয়ায় ভুলে গেছে আগেকার সম্বোধন। আমারও এরকম হয় মাঝে মাঝে

—কিন্তু বিশাখার এরকম ভুল হবার কথা ছিল না।

আমি বললাম, বিশাখা, তুমি কিন্তু একটু রোগা হয়েছো।

বিশাখা একটু অদ্ভুতভাবে হেসে বললো, তুমি ছাড়া একথা এতদিন আমাকে আর কেউ বলেনি! কি খাবে?

—শুধু চা।

—চা এর সঙ্গে আর কিছু খাবে না? তুমি এখনও মিষ্টি খেতে ভালোবাসো? আমাদের এ পাড়ায় খুব ভালো মিষ্টি পাওয়া যায়।

—না, না, আজকাল আর মিষ্টি খাই না। তুমি আমাকে আগে এক গেলাস ঠাণ্ডা জল দাও!

—ঠাণ্ডা জল। খুব ঠাণ্ডা জল তো নেই।

দেবনাথ বিরস মুখে বললো, আমাদের ফ্রিজটা খারাপ হয়ে গেছে।

বিশাখার মুখে তখনও হাসির আভা লেগে আছে, সেটা বজায় রেখেই বললো, হ্যাঁ ভাই, আমাদের ফ্রিজটা দু'মাস হলো খারাপ হয়ে পড়ে আছে!

একই কথা বললো দু'জনে, কিন্তু দু'জনের ভঙ্গি যে দু'রকম সেটা আমি লক্ষ্য না করে পারলুম না। দেবনাথের কথার সুরেই ফুটে উঠলো, ভারতের সমস্ত রেফ্রিজারেটর কোম্পানিগুলো অসৎ, কিংবা বেছে বেছে তাকেই তারা একটা বাজে ফ্রিজ গছিয়েছে। বিশাখা বলতে চায়, ফ্রিজটা এমনি খারাপ হয়ে আছে, যে-কোনো সময় সারিয়ে নিলেই হয়। হয়ে উঠছে না আর কি! বিশাখার ঐ লঘু ভাবটুকুর জন্য আমি কৃতজ্ঞ বোধ করলুম। পৃথিবী সম্পর্কে দেবনাথের অভিযোগ শুনতে শুনতে আমি হাঁপিয়ে উঠেছি। অবশ্য, বিশাখা কোনোদিন পরাজিত হবে, এমন আমি আশাও করিনি।

বললাম, আমার বাড়িতে তো ফ্রিজই নেই। আমার কুঁজোর জলই যথেষ্ট!

দোতলায় অনেকগুলো ঘর, ডানদিকের ঘরগুলোতে দেবনাথের ভাই সোমনাথ তার স্ত্রী-পুত্রদের নিয়ে থাকে। এক সময় সোমনাথের সঙ্গে আমার ভালো আলাপ ছিল, ক্রিকেট ম্যাচের মাঠে প্রায়ই দেখা হতো। একবার ভাবলাম সোমনাথকে ডাকতে বলবো। তারপরই ক্ষীণ সন্দেহ হলো, হয়তো সোমনাথরা এখন আলাদা রান্না করে খায়, দু'ভাইয়ের মধ্যে কথা বন্ধ হওয়াও বিচিত্র নয়। সুতরাং সোমনাথকে ডাকলে একটা অস্বস্তিকর অবস্থা হতে পারে।

বিশাখা নিজেই গেল জল আনতে। দেবনাথ সেই ফাঁকে আমাকে জিজ্ঞেস করলো, বিশাখা রোগা হয়েছে বললে কেন?

তোমার তাই মনে হচ্ছে?

—তাই তো মনে হলো। অনেকদিন পর দেখছি তো।

—দু'বছর ধরে ওর ওয়েট কিন্তু একই আছে।

—তাই নাকি? কিন্তু দেখে তো মনে হলো—

—কিন্তু ওজন একটুও কমে নি।

ব্যাপারটার ওপর দেবনাথ এমন অহেতুক গুরুত্ব দিচ্ছে কেন বুঝতে পারলাম না। 'ও' বলে চেপে যাওয়াই শ্রেয় এখানে।

বিশাখা জল নিয়ে আসতেই দেবনাথ আবার বললো, বিশাখা, দু'বছরের মধ্যে তোমার ওজন একটুও কমেছে? কোনো অসুখ বিসুখও করেনি। তবু সুনীল বললো কেন—

বিশাখা আগের মতনই চাপা কৌতুকে বললো, সুনীলদা আমাকে একটু রোগা হিসেবেই দেখতে পছন্দ করে, সেইজন্য বলছে।

—সেটা আলাদা কথা।

কথার কথা হিসেবেই বলেছিলাম, তার জন্য এত! এটা ঠিক, বিশাখার সুন্দর স্বাস্থ্য আর উজ্জ্বল মুখখানির জন্য, তাকে এখনো অনায়াসেই কুমারী মেয়ে মনে করা যায়। পিঠ ভর্তি এক রাশ কোঁকড়া চুল, এত চুল শহরের মেয়েদের মধ্যে খুবই কম দেখা যায় আজকাল। দুর্গা প্রতিমার মতন টানা-টানা দুটি চোখ, টিকোলো নাকের ঠিক নিচেই, ওপরের ঠোঁটের মাঝখানে একটা খাঁজ, এই রকম খাঁজ থাকলে মেয়েদের খুব বুদ্ধিমতী মনে হয়। সবচেয়ে সুন্দর বিশাখার চিবুক, অবিকল শিশুর মতন, কিংবা খুব কচি সাদা রঙের বেগুনের মতন তক্ তকে। একটা গোলাপ ফুল ছাপা শাড়ি পরে আছে বিশাখা।

ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় বিশাখাকে দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলেনি, এমন ছেলে একটিও ছিল না। বিশাখাকে সঙ্গে নিয়ে রাস্তায় বেরুনোই ছিল মুস্কিল, কেউ না কেউ সিটি দেবেই। বিশাখা শুধু সুন্দরী ছিল না, তার রূপ বড্ড চোখে পড়তো। আশ্চর্য, আজ কিন্তু বিশাখার দিকে চোখ ভরে তাকাতে পারছি না আমি। দু'এক পলক ওর চোখে চোখ রেখেই সরিয়ে নিচ্ছি।

দেবনাথের সঙ্গে বিয়ে হবার পর, সবাই বলেছিল, ভারী সুন্দর মানিয়েছে। আমিও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলাম। এখন কিন্তু আর মানায় না, দেবনাথ এখন অনেক নিষ্প্রভ।

বিশাখা দেবনাথকে জিজ্ঞেস করলো, তুমিও চা খাবে তো!

দেবনাথ বললো, না, এত রাত্তিরে চা খেলে আমার অম্বল হয়!

আমি বললাম, বাঃ, তুমিই চা খাবার জন্য পেড়াপেড়ি করলে আমায়, এখন তুমি নিজে বলছো খাব না!

দেবনাথ বললো, তুমি দিনে অনেক কাপ চা খাও নাকি? আমার ভাই সহ্য হয় না!

—দেবনাথ তোমার আর আমার বয়েস তো প্রায় সমান!

—বয়েস দিয়ে কি আর সব কিছু বিচার করা যায়! তুমি বিয়ে করোনি, আমার বিয়ে হয়েছে সাড়ে চার বচ্ছর আগে।

বিশাখা বললো, বাঃ, বিয়ে করলে বুঝি মানুষ তাড়াতাড়ি বড়ো হয়ে যায়?

ঠাট্টা ইয়ার্কির ধার ধারে না দেবনাথ। ঠাণ্ডা গলায় বললো, বুড়ো হয়েছি কিনা জানি না। তবে বিয়ের পর থেকেই আমার অম্বলের ধাত শুরু হয়েছে।

—মোটেই না। দু'বছর আগেও তোমার 'ওসব কিছু ছিল না। বেশী ভাবলেই মানুষের এসব অসুখ হয়।

—না ভেবে আর উপায় কি!

—আমার কিন্তু জীবনে কখনো ওসব অম্বল টম্বল হয় নি!

এতক্ষণ বাদে একটু স্বচ্ছভাবে হাসলো দেবনাথ। বললো, সেই কথাই তো বলছিলাম, তোমার কোনো অসুখ নেই, তোমার রোগা হবার কোনো কারণও নেই!

আবার সেই প্রসঙ্গ! কি ভুলই করেছিলুম ঐ কথাটা বলে! দেবনাথ এক সময় বেশ চৌকশ কথা বলতে পারতো, এখন যেন সে ইচ্ছে করেই দিন দিন বিরক্তিকর হয়ে উঠছে। অন্যের বিরক্তি সৃষ্টি করেই সে আনন্দ পায়।

দাসীর হাত থেকে চায়ের ট্রে নিয়ে এসে বিশাখা রাখলো সেন্টার টেবিলে। চায়ের কাপ আর সসারগুলো আলাদা রঙের, সাধারণতঃ এসব খুটি নাটি আমার লক্ষ্য করার কথা নয়, কিন্তু বিশাখার বাড়ি বলেই নজরে পড়ছে।

বিশাখা বললো, তুমি যখন চা খাবেই না, তাহলে চান করতে চলে যাও। আমি সুনীলদার সঙ্গে গল্প করি! ওর সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে।

দেবনাথ উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে বললো, হ্যাঁ ভাই, চানটা করে আসি। রোজ বাড়ি ফিরে চান না করলে আমার অস্বস্তি লাগে। যা ধুলো কলকাতার রাস্তায়! তুমি ব'সো, চলে যেও না!

—হ্যাঁ, বসছি।

আমি জানতাম, দেবনাথ আমাকে কিছুক্ষণ বিশাখার সঙ্গে একা থাকার সুযোগ দেবে। কিন্তু বিশাখা নিজে থেকেই যে সে কথা বলবে, তা আশা করি নি।

দু'জনে এক সঙ্গে চুমুক দিলাম চায়ে, এক সঙ্গে কাপ নামিয়ে রাখলাম। মুখ তুলতেই চোখাচোখি হলো! আমিই আবার চোখ সরিয়ে নিলাম প্রথম, চায়ের কাপে সামান্য এক টুকরো সর ভাসছে, সেটাই যেন আমার প্রধান দ্রষ্টব্য!

বিশাখা বললো, কি, সুনীলবাবু এত গম্ভীর কেন? বাবুর কি মন খারাপ?

—বিশাখা দেবী হঠাৎ আজ আমায় তুমি বললেন কেন?

—বিশাখা দেবী ক'দিন ধরেই সুনীলবাবুর কথা ভাবছিলেন কিনা। তাই মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেল!

—মিথ্যে কথা! বিশাখা দেবীর তো আমার কথা ভাবার কোনোই কারণ নেই।

—বিনা করণেও লোকে ভাবে। হঠাৎ হঠাৎ এক একজনের কথা মনে পড়ে যায়। যায় না?

—যখন তখন যার তার কথা ভাবা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো নয়।

আবার দু'জনে এক সঙ্গে চায়ের কাপ তুললাম। এক সঙ্গে চুমুক, এক সঙ্গে নামিয়ে রাখা। আবার চোখাচোখি হতেই দুজনের সামান্য হাসি। বিশাখা বললে, সুনীলদা, তুমি যখন অ্যাদ্দিন বিয়ে করোনি, তখন আর বিয়ে করো না। বিয়ে করলেই যদি ছেলেরা বুড়িয়ে যায়, কিংবা অম্বলের অসুখ হয়, তা হলে ছেলেদের পক্ষে বিয়ে না করাই তো ভালো!

—ঠিক আছে। এখন থেকে মেয়েরাই শুধু বিয়ে করবে। ছেলেরা আর বিয়ে করবে না!

বিশাখা মুখ ভর্তি চা নিয়ে এমন হাসতে লাগলো যে ফোয়ারা হয়ে বেরিয়ে আসে আর কি। আমি আমার মুখের সামনে হাত আড়াল করে ত্রস্তভাবে বললাম, এই, এই, কি হচ্ছে কি।

কিন্তু বিশাখার অকুণ্ঠ হাসি দেখতে আমার ভালোই লাগছিল। আমি বিশাখার সঙ্গে দেখা করতেই ভয় পাচ্ছিলাম এই আশঙ্কায়, যদি সে আগের মতন প্রাণবন্ত না থাকে? দেবনাথের ছোঁয়াচ কি ওর একটুও লাগবে না? কিন্তু দেনবাথের প্রসঙ্গ বিশাখার কাছে এখন মোটেই তোলার ইচ্ছে নেই আমার।

জিজ্ঞেস করলাম, বিশাখা, তুমি আজকাল বাইরেটাইরে বেরোও না? কখনো তো দেখি না! মাঝে মাঝে দেবনাথের সঙ্গে দেখা হয়—

মনে মনে হিসেব করলো বিশাখা। তারপর বললো, প্রায় ছ'মাসের বেশী একটাও—সিনেমা দেখিনি, কোথাও বেড়াতে যাই নি!

—কেন?

—এমনিই! ভালো লাগে না!

—সারা দিনরাত বাড়িতে বসে থেকে কি করো?

—জানালার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলি, কবে সুনলীদা আসবে, আমাকে বেড়াতে নিয়ে যাবার কথা বলবে!

ঠাট্টা ইয়ার্কিরই সম্পর্ক ছিল আমাদের। আমি বিশাখার ব্যর্থ প্রণয়ী নই। পাশাপাশি বাড়ি ছিল এক পাড়াতে, বিশাখার প্রেমে হন্যে হয়ে হুড়োহুড়ি করতোসাত আটটা ছেলে, তাদের দলে ভিড়ে পড়ার একটুও উচ্ছে ছিল না আমার। আমার ছোট বোনের সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল, আমাদের বাড়িতে আসতো মাঝে মাঝে। বিশাখার আড়ালে যখন বিশাখার নিন্দে হতো আমাদের বাড়িতে, তখন তাতে মাঝে মাঝে আমিও যোগ দিয়েছি। আমার মা বলতেন, রংটা ফর্সা বলে মেয়েটা বড্ড দেমাকী হয়ে গেছে, মাটিতে যেন পা পড়ে না! ওর বাবা মা আবার বেশী আস্কারা দিয়ে মেয়েটার মাথা খাচ্ছে। আবার বিশাখা বাড়িতে এলে, মা-ই বলতেন, তুই তো আমার মেয়ের মতন, তোর আবার লজ্জা কি রে! আমার বোনের নাম অঞ্জনা, কিন্তু ওদের দু'জনকে সবাই বলতো ললিতা-বিশাখা

আমার বোনের বিয়ে হয়ে যাবার পরও বিশাখা মাঝে মাঝে আসতো আমাদের বাড়িতে। আমি ওকে দু'একদিন সিনেমায় নিয়ে গেছি, লেকেও গিয়েছিলাম কয়েকবার। এর জন্য অবশ্য ছাদ থেকে চিঠি ছোঁড়াছুঁড়ি করতে হয়নি আমাদের, সিঁড়ির পাশে নিরালায় দাঁড়িয়ে গাঢ় স্বরে কথা বলতে হয়নি। বিশাখাই এসে কোনো বিকেলে বলতো, সুনীলদা, তুমি বড্ড কিপ্টে হয়ে যাচ্ছো, গ্রেগরি পেকের বইটা তুমি দেখাও না আমাকে! মাসীমা, আপনি একটু বলুন তো! ছেলেবেলা থেকেই বিশাখা নাম-করা সুন্দরী, সে ধরেই নিয়েছিল, তাকে প্রায়ই কেউ না কেউ সিনেমা দেখাবে, বেড়াতে নিয়ে যাবে। অনেকেই যেত। কিন্তু বিশাখার চরিত্রে একটা ঝকঝকে দিক ছিল, এই জন্য কেউ তার অপবাদ ছাড়ায় নি।

আমাদের বাড়িতে আমরা সবাই জানতাম, যতই ছেলেটেলের সঙ্গে ঘুরুক, বিশাখার বিয়ে হবে বাড়ির পছন্দমত কারুর সঙ্গে। বিশাখাও তাতে

আপত্তি করবে না। আজকাল আর কোনো ধনী পরিবারের মেয়ে হঠাৎ কোনো গরীব স্কুল মাস্টারের প্রেমে পড়ে না। কিংবা একটু-আধটু প্রেম হলেও বিয়ে করতে চায় না।

বিশাখার প্রেমিকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী নাছোড়বান্দা ছিল মনুজেশ। মনুজেশকে আমিও চিনতাম, আমার মাসতুতো ভাইয়ের বন্ধু ছিল সে। আমাদের গলির মোড়ে তাকে নিয়মিত দেখা যেত। বিশাখার প্রেমে সে একেবারে পাগল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু মনুজেশ তখন জানতো না, একটি মেয়েকে শুধু ভালোবাসাই তাকে পাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট নয়! মনুজেশ আমাকে বলতো, ওর হয়ে একটু চেষ্টা করতে।

কিন্তু বিশাখার তখন ঠিক প্রেমের চেতনা ছিল না। ছেলেদের সঙ্গে বেড়াবে, গল্প করবে, হাতে হাত রাখবে, এই কি প্রেম? বড় জোর কেউ জড়িয়ে ধরতে চাইলে বলবে অসভ্য! বিয়ে তো অন্য ব্যাপার!

হলোও তাই, বিশাখার বাড়ি থেকে পছন্দ করা হলো দেবনাথকে। বিয়ের কিছুদিন আগে বিশাখার সঙ্গে তার আলাপ করিয়ে দেওয়া হলো তারা এখন প্রেমিক-প্রেমিকার মতন ঘোরাঘুরি করতে লাগলো। তখন বেশ চালু ছেলে ছিল দেবনাথ, একটা নীল রঙের গাড়িতে চেপে এসে হর্ন দিত বিশাখার বাড়ির সামনে।

আমার সঙ্গে আবার দেবনাথের পরিচয় বেরিয়ে পড়লো, আমরা একসঙ্গে কলেজে পড়তাম, খুব বন্ধুত্ব ছিল না যদিও, কিন্তু মুখ চিনতাম। এমন অনেকদিন হয়েছে, দেবনাথ এক সঙ্গে আমাকে আর বিশাখাকে গাড়িতে চাপিয়ে বেড়াতে কিংবা রেস্টুরেন্টে খেতে নিয়ে গেছে। বিশাখা তার অন্য প্রেমিকদের নানা কীতিকলাপ নিয়ে গল্প করতো আমার কাছে। কিন্তু দেবনাথ বিষয়ে কিছু বলেনি। যথেষ্ট ছেলেমানুষ ছিল তখনও, কিন্তু এটুকু অন্তত বুঝতে পেরেছিল যে, যাকে বিয়ে করবে, তাকে খুশী করে চলতে হয়। তখন দেবনাথের সামনে বিশাখা আমাকে আপনি বলতো।

বিশাখাকে আমি কোনোদিন বিরলে প্রেম জানাইনি, সুতরাং তার বিয়েতে আমার মন কেমন করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। তবে, যে কোনো কুমারী মেয়ের বিয়ে হয়ে গেলেই যে কোনো যুবকের একটু বুকটা টন্‌টন করে ওঠে। সাত পাকের সময় আমিই পিঁড়ি ধরে ঘুরিয়েছিলাম বিশাখাকে। পড়ে যাবার ভয়ে কিংবা কিছু একটা সান্ত্বনা পাবার জন্য আমার হাত চেপে

ধরেছিল বিশাখা। বিয়ের দিন কি সুন্দর দেখাচ্ছিল বিশাখাকে, সেদিন যে আমার একটু দুঃখ হয়েছিল, সেটা ব্যর্থ প্রেমিকের মন খারাপ নয়, অসম্ভব সুন্দর কিছু দেখার বেদনা।

আমি বললাম, এখন বিয়ে হয়ে গেছে, এখন আবার অন্যাদের সঙ্গে বেড়াতে যাবার ইচ্ছে কেন?

—বিয়ে হয়ে গেছে বলে কি আমি বদলে গেছি নাকি?

—আমার বোন অঞ্জনা তো দুটো বাচ্চা হবার পর রীতিমত গিন্নী হয়ে গেছে!

বিশাখা একটু দুঃখিত ভাবে বললো, অঞ্জনা আর আমাকে এখন চিঠি লেখে না। ও এখন কানপুরেই আছে তো? আমি আশা করেছিলাম, এই সময়ে আমাকে অনেকেই চিঠি লিখবে।

—অঞ্জনা বোধহয় কিছু জানে না! ও নিজের সংসার নিয়েই এত ব্যস্ত! তোমার তো ছেলেপুলে হয়নি, তুমি বুঝবে না।

বিশাখা আবার একটু গম্ভীর হয়ে গেল।

হাল্কা ভাব আনার জন্য আমি আবার বললাম, তোমার সব আগেকার প্রেমিকদের সঙ্গে আর দেখা হয় না?

সংক্ষিপ্ত ভাবে বিশাখা জানালো, না!

—মনুজেশের সঙ্গেও আর দেখা হয় না! ও বেচারা বড্ড আঘাত পেয়েছিল!

—মনুজেশের বিয়ে হয়নি?

—আমি তো যদ্দুর জানি, এখনো বিয়ে করে নি।

বিশাখা ও প্রসঙ্গ নিয়ে আর কথা বলতে চাইলো না! একটু চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করলো, মাসীমা কেমন আছেন?

—ভালো।

—আর তোমার ছোট ভাই রঞ্জু?

—ও তো এখন ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে চাকরি খুঁজছে।

—জানো, রঞ্জুর সঙ্গে একদিন আমার রাস্তায় দেখা হয়েছিল, ও আমাকে চিনতেই পারলো না। দেখেও না দেখার ভাব করে এড়িয়ে গেল!

আমি বিব্রত ভাবে বললাম, যাঃ সে কি! ও নিশ্চয়ই দেখতে পায়নি। দেখলে চিনতে পারবে না কেন?

বিশাখা হঠাৎ চটে উঠলো। ঝাঁঝের সঙ্গে বললো, বাজে কথা বলো না! আমি জানি আজকাল সবাই আমাকে এড়িয়ে যেতে চায়। আমি সেইজন্যই তো আজকাল আর বাইরে বেরোই না! তুমিও ঐজন্যই আসো না আমি জানি!

—না, বিশাখা, সত্যি বিশ্বাস করো, আজকাল অফিসের কাজে এত ব্যস্ত থাকতে হয়! প্রায়ই যেতে হয় টুরে।

এক পলকের মধ্যে বিশাখার সুন্দর মুখখানা কি রকম অসহায় হয়ে গেল। সাঁতার জেনেও মানুষ যখন সমুদ্রে ডুবে যায় তখন তার মুখের চেহারা বোধহয় এই রকম হয়। বিশাখার মতন মেয়েকে দেখেও যে চেনা লোকেরা এড়িয়ে যেতে চায়, একথা অকল্পনীয়, মর্মান্তিক, নিষ্ঠুর হলেও কিছুটা যে সত্যি, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। যারা এড়িয়ে যেতে চায়, তাদেরও খুব দোষ দেওয়া যায় না, তারাও পড়তে চায় না একটা অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে! অবশ্য, বিশাখার এই রকম অবস্থার সুযোগ নিয়ে কিছু লোক যে তার দিকে বেশী বেশী উৎসাহ দেখাবে তাতেও কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু বিশাখার আত্মসম্মানজ্ঞান এত প্রবল যে তাদের সে গ্রাহ্যই করবে না নিশ্চিত। এখন বিশাখাকে যারা বেশী সমবেদনা দেখাতে আসবে, তাদেরও সে ঘৃণা করবে।

একটুক্ষণের মধ্যেই বিশাখা নিজেকে সামলে নিল। নম্রভাবে বললো জানি, অফিসে তোমার উন্নতি হয়েছে। এখন তো তুমি ব্যস্ত থাকবেই!

—না, না, এমন কিছু উন্নতি নয়! এই একটা পোস্ট খালি হয়েছিল।

আমার চাকরিতে উন্নতির জন্য আমার একটু লজ্জা করতে লাগলো! দেবনাথের এই অবস্থায় আমার উন্নতি হওয়াটাও যেন একটা অপরাধ। আমি একটু অস্থিরভাবে বললাম, দেবনাথ এখনো এলো না! কতক্ষণ ধরে চান করছে?

—ওর প্রায় একঘন্টা লাগে! বাতিক হয়েছে তো আজকাল!

—বিশাখা, আজ আমি উঠি। অনেক রাত হয়ে গেল।

—মোটে ন'টা বাজে। আর একটু বসো! সুনীলদা তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করবো?

বিশাখা কি জিজ্ঞেস করবে, আমি জানি। এতক্ষণ মনে মনে এর জন্যই ভয় পাচ্ছিলাম। কত সাবধানে কথা বলতে হয়েছে। কিন্তু আর তো উপায়

নেই। আমার যেন দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগলো। এখন এক দৌড়ে ছুটে পালিয়ে যাওয়া যায় না?

কোনোক্রমে মুখে হাসি এনে বললাম, কি কথা? তোমার জন্য এখনও আমার কষ্ট হয় কিনা?

—না ঠাট্টা নয়—

—আমি মোটেই ঠাট্টা করছি না।

—না, তুমি আগে বলো, তুমি ব্যাপারটা বিশ্বাস করো?

—কোন্ ব্যাপারটা?

—তুমি ঠিক জানো। তুমিও এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছো?

—না, মানে, দেবনাথকে আমি যে-রকম চিনতাম, তাতে সত্যিই তো বিশ্বাস করা যায় না। তা ছাড়া, তুমি নিজেই তো এ ব্যাপারটা সবচেয়ে ভালো বলতে পারবে!

—সে কথা নয়, তুমি নিজের কথা বলো। তুমি নিজে বিশ্বাস করো কিনা! এ কখনও সত্যি হতে পারে?

খবরের কাগজের প্রথম পাতায় বেরিয়েছিল খবরটা! চেনাশূনো তো এমন কেউ নেই যে দেখেনি। সি বি আই-এর তদন্তের ফলে কলকাতায় এগারোজন অফিসারকে সাসপেন্ড করা হয়েছিল, দেবনাথ তার মধ্যে একজন। দেবনাথের বাবা ইনকাম ট্যাক্সের কমিশনার ছিলেন এক সময় বাবার জোরেই বড় চাকরি পেয়ে ছিল। দেবনাথের বাবা রিটায়ার করার পরের মাসেই মারা যান। দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার এবং প্রায় সাতষট্টি হাজার টাকার অপব্যবহারের অভিযোগ দেবনাথের নামে। ফলাও করে ছাপা হয়েছিল এই সব। অফিসারদের ঘুষ খাওয়ার ব্যাপারটা এতই সাধারণ এখন যে, কারুর নামে ছাপার অক্ষরে ঐ অভিযোগ বেরুলে কে আর অবিশ্বাস করবে। আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যেও অনেকেরই ও রকম ঘুষখোর অফিসার-টফিসার থাকে, তাতে কিছু যায়-আসে না, কিন্তু যে ধরা পড়ে, সেই ঘৃণ্য।

দেবনাথের অবশ্য এখনও চাকরি যায়নি। সাসপেন্ডেড হয়ে আছে, সি বি আই-র রিপোর্টকে চ্যালেঞ্জ করে কেস তুলেছে হাইকোর্টে। দু মাস অন্তর তার ডেট পরে। জিনিসটা যে কতখানি মিথ্যেভাবে সাজানো এবং তাকে অপদস্থ করার জন্য সহকর্মীদের চক্রান্ত, সে কথা দেবনাথের মুখে বহুবার শুনতে হয়েছে আমাকে। মিথ্যে যে হতে পারে না তা নয় কিন্তু তারপর থেকেই কেন এরকম বিবর্ণ পরাজিত হয়ে গেল দেবনাথ? তার সততা যদি

প্রশ্নের অতীত হয়, তা হলে সাহসের সঙ্গে সে কেন রুখে দাঁড়াতে পারছে না? তার নিজের ব্যবহারেই সে সামাজিক ভাবে একঘরে হয়ে যাচ্ছে।

আমি বিশাখাকে বললুম, দ্যাখো, সত্যি কথা বলতে কি, আমি নিজেও একজন সরকারী অফিসার। আমার এ সম্পর্কে এখন কোনো মন্তব্য উচিত নয়! মামলা চলছে, মামলার ফলাফলেই আসল ব্যাপারটা জানা যাবে।

বিশাখা একটু চুপ করে রইলো। তারপর বললো, তোমাকে কি আজ ও জোর করে ধরে এনেছে?

সত্যি কথাটা সব সময় তো বলা যায় না। আমার নিজের চাকরির স্বার্থে এবং আমার বিবেক অনুযায়ী, দেবনাথের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক রাখা উচিত নয়। তার চেয়েও বড় কথা, তার ঐ পরাজিত মনোভাব মাঝে মাঝে আমার অসহ্য লাগে, সেইজন্যই আমি ওকে এড়িয়ে চলতে চাই।

চেষ্টা করে হাসি ফুটিয়ে বললাম, না, না, আজ বাসে ওর সঙ্গে দেখা হলো ভাবলাম অনেকদিন তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি তাই চলে এলাম। জোর করে আনবে কেন?

—ভদ্রতা রাখার জন্য বলছো ত?

আমি সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা বলছি, তবু বিশাখার কাছে নকল অভিমান দেখিয়ে বললাম, তুমি আমার কথা বিশ্বাস করছো না!

—আমি কয়েকদিন থেকেই তোমারি কথা ভাবছিলাম। মনে মনে আশা করছিলাম, হয়তো তুমি একদিন আসবে।

—এই তো এলাম। আমি ঠিক টেলিপ্যাথিতে খবর পেয়েছিলাম।

আমার হাসির উত্তর দিল না বিশাখা। গম্ভীরভাবে বললো, আমি সত্যি ঘটনাটা জানতে চাই।

—তুমি ওর স্ত্রী। তোমারই তো আসল কথাটা জানা উচিত।

—আমাকে তো কোনোদিন কিছু বলে নি। কোনোদিন তো ও বাড়িতে খুব বেশী টাকা আনে নি।

—বিশাখা, তুমি তো টাকা-পয়সার হিসেব কিছুই বুঝতে না।

—এটুকু অন্তত বুঝি! তোমার মেসোমশাই দিল্লীতে হোম ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারি না? এখনও আছেন, না রিটায়ার করেছেন?

—এখনও আছেন।

—সেন্ট্রাল বুরো অব ইনভেসটিগেশান তো হোম ডিপার্টমেন্টেরই অধীনে? তাই না? সুনীলদা, তুমি একটু তোমার মেসোশাইকে অনুরোধ করে সঠিক খবরটা জেনে দেবে?

এবার আমার গম্ভীর হবার পালা। নোখ দিয়ে টেবিলের ওপর দাগ কাটতে কাটতে বললাম, তুমি এইজন্যই ক'দিন ধরে আমার কথা ভাবছিলে?

ভারী কাতরভাবে হাসলো বিশাখা। এরকম কাতরতা ওর মুখের সঙ্গে মানায় না। কুণ্ঠিত ভাবে বললো, যদি বলি হ্যাঁ, তুমি খুব আহত হবে?

—না, না, আহত হবো কেন?

—সত্যি কথা বলতে কি, অনেকটা এইজন্যই। তা ছাড়া কোথা থেকে একটা বিশ্বাসও এসে গিয়েছিল, আর সবাই আমাদের এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলেও তুমি করবে না। এক সময় তো আমরা তিনজনেই বন্ধু ছিলাম। তোমাকে এমনিতেও দেখতে ইচ্ছে করতে পারে তো!

—আমার মেসোমশাই দারুণ কড়া লোক। অফিসের কাজের ব্যাপারে মাথা গলানো একদম পছন্দ করেন না!

—তুমি আমাকে ভুল বুঝো না। আমি কোনো অন্যায় সুযোগ চাইছি না। দয়াও চাই না। আমি চাই শুধু সত্যি কথাটা জানতে!

একবার আমার বলতে ইচ্ছে হলো, বিশাখা, তুমি শুধু শুধু দেবনাথকে আঁকড়ে থাকতে চাইছো। দেবনাথ ফুরিয়ে গেছে, শেষ হয়ে গেছে—দোষী বা নির্দোষ যাই হোক দেবনাথ আর আগেকার অবস্থা ফিরে পাবে না! তোমার মন এখনও এমন তাজা, স্বাস্থ্য এত সুন্দর তুমি দেবনাথকে ছেড়ে চলে যাও!

কিন্তু এ কথা বল যায় না। কোনো মেয়েকে কোনো পুরুষ বলতে পারে না, স্বামীকে ছেড়ে তুমি চলে যাও, বলতে হয়, স্বামীকে ছেড়ে তুমি আমার সঙ্গে চলে এসো! কিন্তু আমি তো সে কথা বলতে চাই না! আমি তো বিশাখা সম্পর্কে ওরকম ভাবে কখনও ভাবি নি! তা ছাড়া বিশাখা দারুণ জেদী মেয়ে, আমি ওকে চিনি, অন্য সময় দেবনাথের ওপর রাগ করে ও হয়তো চলে যেতে পারতো কিন্তু দেবনাথকে বিপদের মধ্যে ফেলে রেখে ও পালাবে না। সে স্বভাব ওর নয়। অসহায় মানুষকে ছেড়ে যেতে বোধ হয় কোনো মেয়েই পারে না!

বললাম, ওর যদি সত্যিই কোনো দোষ না থাকে, তাহলে তো মামলায় জিতবেই। এরকম অনেক দেখা গেছে, মামলায় জেতার পর আবার চাকরি ফিরে পেয়েছে।

—আমি চাকরির কথা ভাবছি না! মামলায় কি সব নির্দোষ লোকেরা ছাড়া পায়? সব দোষী শাস্তি পায়? সে কথা যাক, মামলা কবে শেষ হবে তারই তো ঠিক নেই। তুমি আমাকে সাহায্য করবে কিনা বলো।

কথা এড়াবার জন্য বললাম, শোনো বিশাখা, তুমি দেখতে পাচ্ছো না, দিন দিন দেবনাথ কিরকম মনমরা হয়ে যাচ্ছে। এত ভেঙে পড়ার কি আছে! কত সত্যিকারের চোরও তো আজকাল বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ায়।

বিশাখা কঠোরভাবে বললো, কোনো সত্যিকারের চোরের সঙ্গে আমি একসঙ্গে থাকতে চাই না। তা হলে যে-সব শাড়ি আমি পরেছি, যে-সব গয়নায় সেজেছি—সেগুলোর জন্য আমার শরীর জ্বলে যাবে। সুনীলদা, তুমি তোমার মেসোমশাই-এর কাছ থেকে আমাকে সত্যিকারের ব্যাপারটা জেনে দেবে কিনা আগে বলো? শুধু জেনে দাও, সত্যিকারের কোনো প্রমাণ আছে কিনা।

—দেখো, এসব মারাত্মক ব্যাপার তো চিঠিতে লেখা যায় না! তাহলে আমাকে দিল্লী যেতে হয়।

বিশাখা উঠে এলো আমার পাশে। আমার হাতের ওপর হাত রেখে গাঢ় স্বরে বললো, তুমি আমার জন্য একবার যাবে?

—শোনো বিশাখা, ব্যাপারটা—

—না, তুমি আমাকে বলো আগে, তুমি আমার জন্য এটুকু করবে কিনা?

আমার হাতের ওপর রাখা বিশাখার হাত। নরম কোমল আঙুল, নোখে লালচে স্বাস্থ্যের আভা, অনামিকায় একটা পান্না বসানো আংটি। বিয়ের দিন সাতপাকের সময় যখন পিঁড়ি ধরে ঘোরাচ্ছিলাম, তখন এই আংটি পরা হাতে বিশাখা আমার হাত চেপে ধরেছিল। মানুষ পারে এরকম অনুরোধ উপেক্ষা করতে? বুকের মধ্যে শিরশির করতে লাগলো, নাকে এসে লাগছে বিশাখার শরীরের নিজস্ব ঘ্রাণ।

বললাম, আচ্ছা যাবো—

—কথা দাও?

—কথা দিলাম!

—এজন্য আমি তোমাকে সারা জীবন ভালোবাসবো!

—ছিঃ বিশাখা, এসময় ভালবাসার কথা বলে না।

এবার আমার অসৎ হবার পালা। এখন আমাকে অনেক মিথ্যে কথা বলতে হবে, পালিয়ে বেড়াতে হবে বিশাখার কাছ থেকে। বিশাখাকে আমি কথা দিয়ে এসেছিলাম, কিন্তু সে কথা রাখা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

আমার মেসোমশাই আমাকে চু'চক্ষে দেখতে পারেন না। আমার মাসতুতো বোন রন্টি একটি মদ্রাজী ক্রিশ্চানকে বিয়ে করেছে, মেসোমশাই প্রায় সারা ভারতের পুলিসবাহিনী নিয়োগ করে সেই বিয়ে আটকাতে চেয়েছিলেন। পারেন নি। সেই সময় আমি রন্টিকে খানিকটা সাহায্য করেছিলাম, সেই থেকে রাগ। আমি দিল্লীতে কখনও গেলে হোটেলে উঠি, মেসোমশায়ের বাড়িতে উঠি না। মাসীমা মারা যাবার পর, মেসোমশাই কঠোর সন্ন্যাসীর মতন কৃচ্ছ্রন্ন জীবন-যাপন করছেন, অবশ্য ঈশ্বরের বদলে তাঁর সাধনা চাকরির উন্নতির জন্য। সেন্টারে হোম ডিপার্টমেন্টের ডেপুটিসেক্রেটারি হয়েছেন, আশা আছে, রিটায়ার করার আগে সেক্রেটারি হবেন।

এসব কথা বিশাখাকে বলা যেত না। ও তা হলে ধরেই নিত, আমি নিছক ওকে এড়াবার জন্যই এগুলো বানিয়ে বলছি। সত্যি কথাও অনেক সময় খুব দুর্বল শোনায়।

তা ছাড়া, মেসোমশায়ের সঙ্গে যদি আমার ভালো সম্পর্কও থাকতো, তা হলেও, চাকরির ব্যাপারে সামান্য গোলমাল হতে পারে, এরকম কাজ উনি কিছুতেই করতেন না। সি বি আই-এর গোপন রিপোর্ট বাইরের কারুর কাছে, বিশেষত অভিযুক্ত লোকের কাছে ফাঁস করে দেওয়া মারাত্মক অপরাধ। এ খবর জানতে চাইলে মেসোমশাই হয়তো আমাকেই পুলিসে ধরিয়ে দিতেন।

এটা আমার চাকরির পক্ষেও বিপজ্জনক। দিল্লী না হোক, কলকাতার ছোট ডিপার্টমেন্টেও আমার দু'একজন চেনা আছে। কিন্তু সেখানে খোঁজখবর নেবারও দারুণ ঝুঁকি আছে। একজন দুর্নীতিপরায়ণ অফিসারের জন্য আমি তদ্বির করছি এ কথা কেউ প্রকাশ করে দিলে, আমার অবস্থা কি হবে? আমাকেও ঐ দলে ফেলা হবে না? খবরের কাগজের লোকেরা মুখিয়ে আছে, তাদের চর আছে সব সরকারী অফিসে। যে কেরানীটি আমাকে ফাইল

দেখাবে, সে-ই হয়তো জানিয়ে দেবে খবরের কাগজে। বেশির ভাগ খবরের কাগজ কেচ্ছা ছাপাতে খুব উৎসুক, পাঠকরাও ঐ সবই পড়তে চায়। একবার যদি কারুর নামে স্পাই কিংবা ঘুষখোর অপবাদ রটিয়ে দেওয়া যায় তা হলে ঘনিষ্ঠ নিকটাত্মীয়রাও পুরোপুরী অবিশ্বাস করতে চায় না। তা ছাড়া বিশাখার জন্য আমি এই সব ঝুঁকি নেবো কেন, আমি তো বিশাখার প্রেমিক নই! দেবনাথ সম্পর্ক আমার বিন্দুমাত্র সহানুভূতিও নেই।

যত রাগ পড়লো দেবনাথের ওপর। তুমি নিজেই এই কাণ্ডটি বাধিয়েছো, নিজে এর থেকে বাঁচার চেষ্টা করতে পারো না! তা নয়, আমাকে জোর করে বাড়িতে ধরে নিয়ে গিয়ে বউয়ের সামনে ভজিয়ে দিয়ে নিজে ঢুকে রইলে বাথরুমে! মহা হারামজাদা একটি! সুন্দরী বউকে দিয়ে বন্ধুদের ব্ল্যাকমেইল করানো। তুমি ঘুষ খেয়েছো, আর সি বি আই-এর কোনো অফিসার ঘুষ খায় না? ষাট-পঁয়ষট্টি হাজার টাকা যদি মেরেই থাকো, তার থেকে কিছু ঘুষ দিলে পারতে! নাকি সে বেলায় কিপ্টেমি করেছিলে? শুধু লেবোরাম দেবো না দাস হয়ে থাকতে চাও? কিন্তু যদি অত টাকাই নিয়ে থাকে, তা হলে অতগুলো টাকা দিয়ে দেবনাথ করলো কি?

দিন চারেক বাদে অফিস থেকে দুপুরবেলা ফোন করলাম মনুজেশকে। মনুজেশ সব সময়ই বেশ উৎফুল্ল থাকে। একটা মার্কেন্টাইল ফার্মে চাকরি করে, মদ খায়, মেয়েদের সম্পর্কে বেশ তরল। এককালের সেই গদগদ প্রেমিকটি কোথায় হারিয়ে গেছে।

—মনুজেশ, হাতে কাজ কি রকম? আজ আমার সঙ্গে লাঞ্চ খাবে নাকি?

—হ্যালো, ওল্ড বয়! হঠাৎ নেমন্তন্ন যে!

—এমনিই, আজ শখ হলো চীনে খাবার খাবো। একা একা তো খাওয়া যায় না!

—তা বলে আমার সঙ্গে? এরকম লাভলি ওয়েদার, এসময় তো কোনো মেয়ে বন্ধুটন্ধুর সঙ্গে যাওয়া উচিত।

—আমি আর মেয়েবন্ধু কোথায় পাবো বলো?

—কেন, গত বছর যে একটি ম্যারেড মেয়ের সঙ্গে খুব ঘুরতে দেখতাম?

—আরে, সে তো আমার মাসতুতো বোন রন্টি!

—মাসতুতো বোন? আপন, না দূর সম্পর্কের? চোরে চোরে যেমন মাসতুতো ভাই হয়, সে রকম—

—বাজে কথা ছাড়ো, তুমি আসবে?

—শুধু খাবার খাওয়া হবে? এরকম ওয়েদার, একটু হজমি কিছু পানটান করা হবে না!

—সে তুমি খেতে পারো ইচ্ছে হলে এখন সওয়া একটা বাজে, তা হলে ঠিক দু'টোর সময়—

মনুজেশকে ডাকার আগেও আমার কোনো পরিকল্পনা ছিল না। বিশাখার কাছে কথা দিয়েও কথা রাখতে পারবো না ঠিক করে ফেলেও বিশাখার চিন্তা কিছুতেই মন থেকে তাড়াতে পারছিলাম না। একা একা নিজের সঙ্গে তর্ক করছিলাম অনবরত। দেবনাথের জন্য কি বিশাখাকেও দোষী করা যায়? সে কেন এর ফল ভোগ করবে? ওর মতন অমন একটা সুন্দর প্রাণবন্ত মেয়ে—দিনের পর দিন ঘরের মধ্যে বসে থাকবে, লোকের সঙ্গে মিশতে লজ্জা পাবে কেন? কিন্তু বিশাখার জন্য আমি কি করতে পারি? বিশাখা, তুমি আমায় মিথ্যেবাদী করলে কেন? কেন আমার শান্তি নষ্ট করলে? মানুষ আজকাল নিজের সমস্যা নিয়েই সামলাতে পারে না, অপরের সমস্যা কেন ঘাড়ে চাপানো!

মনুজেশ আজকাল কিরকম স্মার্ট হয়েছে, টিরিলিনের স্যুটটা পরেছে নিখুঁত কায়দায়, কি অবহেলার সঙ্গে সিগারেটটা ধরে আছে। যে-কোনো মুহূর্তে পড়ে যেতে পারে, অথচ পড়বে না! কমার্শিয়াল ফার্মে ঢুকলে ক্যাবলারাও চালাক হয়ে যায়। আর সরকারী অফিসে আমাদের তো যা অবস্থা, দিন দিন বেড়ালের মতন গোঁফ দিয়ে ফিক ফিক করতে হয়।

মুরুব্বি চালে আমার কাঁধে চাপড় দিয়ে মনুজেশ বললো, কি খবর বলো!

—খবর আর কি! অনেকদিন তোমার সঙ্গে দেখা নেই।

—তুমি তো আর পার্ক স্ট্রীট পাড়ায় আসো না! তা হঠাৎ আমার কথা মনে পড়লো যে?

—একজনের মুখে তোমার নাম শুনলাম কিনা!

—একজন? কে একজন?

—বিশাখা।

মনুজেশ এমনভাবে আমার দিকে তাকালো, যেন ও আমাকে সেই মুহূর্তেই খুন করতে চায়, কিংবা আমার মধ্যে ও অলৌকিক কিছু প্রত্যক্ষ করেছে। ওর মুখে যে বুদ্ধির চাকচিক্য কিংবা সৌখিনতার জৌলুস ছিল—সেটা সম্পূর্ণ মুছে গেল, ফুটে উঠলো একটা সরল লাজুক মুখ, তাতে সামান্য বেদনার চিহ্ন। কিন্তু তিরিশ বছর বয়েস পেরিয়ে গেলে মানুষ এই ধরনের সরল মুখ দেখাতে লজ্জা পায়। মনুজেশও একটু লজ্জা পেয়ে, সেটা কাটানোর জন্য তুখোড় কায়দায় টুস্‌কি দিয়ে বেয়ারাকে ডাকলো, ডেকে বললো, হামারা লিয়ে এক বিয়ার, একদম চিল্‌ড হোনা চাইয়ে, আউর সাহাবকো লিয়ে—সুনীল তুমি কি খাবে?

—আমি ওসব খাবো না। আমি সুপ খাবো। চিকেন উইথ কর্ন। বেয়ারা চলে যাবার পর মনুজেশ নিচু গলায় বললো, বিশাখার সঙ্গে কোথায় দেখা হলো?

—কয়েকদিন আগে বিশাখার বাড়িতে গিয়েছিলাম।

—তোমার সঙ্গে বুঝি ওর যোগাযোগ আছে এখনও?

—হ্যাঁ। দেবনাথও তো আমার বন্ধু!

—ওর নামে কি একটা স্ক্যান্ডাল বেরিয়েছে না কাগজে?

—তুমি জানো তা হলে?

—খবরের কাগজে বেরোয় তো লোককে জানাবার জন্যই! তা ছাড়া আমাদের অফিসে মিত্তিরের কাছে শুনেছি। মিত্তিরের সঙ্গে ওর তো আবার প্রায়ই রেসের মাঠে দেখা হয় কিনা!

—দেবনাথ রেস খেলে?

—তুমি জানো না? আমিও তো দু'একদিন গিয়েছিলাম, তখনও ওকে দেখেছি।

দেবনাথের এ পরিচয়টা আমার সত্যিই জানা ছিল না। রেস খেলার ব্যাপারটা যেন দেবনাথের চরিত্রের সঙ্গে মানায় না। সন্দেহ কি, দেবনাথ প্রতিবার ভুল ঘোড়ার ওপরই বাজি ফেলেছে। যে হেরে যাবার জন্য বদ্ধপরিকর, তাকে কে জেতাবে? কিন্তু মনুজেশ মিথ্যে কথা বলছে না তো? প্রাক্তন প্রেমিকার স্বামীকে কেউই পছন্দ করে না। তার সম্পর্কে নিন্দে ছড়ানোই নিয়ম।

আমি সাবধান হয়ে জিজ্ঞেস করলুম, তোমারও রেসটেস খেলার অভ্যেস আছে নাকি?

মনুজেশ কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো, মাঝে মাঝে যাই মাঠে, স্পোর্টস হিসেবে দু'-একটা খেলি। এর জন্য দেবনাথের মতন আমাকে অফিসের টাকা মিসঅ্যাপ্রপ্রিয়েট করতে হয় না অবশ্য! হি ইজ এ সিলি অ্যাস্।

আমি এবার হৃষ্টভাবে হাসলুম। বললুম, তোমার এখনও ঈর্ষা আছে দেবনাথ সম্পর্কে। ঐ সব ঈর্ষাটির্ষা কিন্তু বাচ্চা বয়েসেই মানায়।

মনুজেশ একটু অবাক হয়ে বললো, ঈর্ষা! ধ্যাৎ! দেবনাথ সম্পর্কে আমার মায়া হয়।

—আচ্ছা, দেবনাথের তো অনেক গুণ ছিল, তবু সে এরকম হয়ে গেল কেন?

—তার কারণ, ও ওর স্ত্রীকে ভালোবাসতে পারে নি।

—তোমাকে বুঝি সে কথা ও কানে কানে বলে গেছে?

—একটু ভেবে দেখলেই তো বুঝতে পারা যায়! ব্যাপারটা কি হয়েছে জানো, বিশাখা ওর পক্ষে মাপে একটু বড় হয়ে গেছে—দেবনাথের যতখানি ভালোবাসার ক্ষমতা, বিশাখার দাবি তার চেয়ে অনেক বেশী। দেবনাথ বেচারা তাই উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে গেল!

—তুমি সব জেনে বসে আছো! ক'বার বিয়ে করেছো তুমি? আমি নিজে বিয়ে না করলেও জানি।

—কিন্তু বিশাখার মধ্যে অসাধারণত্ব কি আছে? বিশাখা বেশ সুন্দরী কিন্তু ওরকম সুন্দরী মেয়ে ঢের ঢের আছে।

—সে রকম ভাবে বিচার করতে গেলে অবশ্য অসাধারণত্ব কিছু নেই!

—বিয়ের সময় ছেলে হিসেবে দেবনাথও মোটেই খারাপ ছিল না।

—দেখো, আমারও একটা ভদ্রতা বোধ আছে। দেবনাথ যেহেতু বিশাখার স্বামী, সেই জন্যই তার আমি কোনে রকম নিন্দে করতে চাই না—তা হলে সবাই ভাববে আমি ঈর্ষা থেকে বলছি। কিন্তু যে লোক বউকে খুশী করার জন্য অফিসে টাকা চুরি করে—

আমি মনুজেশের মুখের সামনে হাত তুলে বললাম, শোনো, শোনো, মনুজেশ, উত্তেজিত হয়ে যাচ্ছো কেন? আস্তে কথা বলো! প্রথম কথা, দেবনাথ যে টাকা চুরি করেছে, সেটা এখনও প্রমাণিত হয় নি—সুতরাং তোমার ওভাবে বলা উচিত নয়। দ্বিতীয়ত, পৃথিবীতে আরও ঢের ঢের লোক অফিসে টাকা চুরি করে, তারা সবাই বউয়ের কথা ভাবে না।

—খবর নিয়ে দেখো গে, তারা সবাই বউকে খুশী করার জন্যই যত সব অপকীর্তি করে। এর মধ্যে দু'ধরনের লোক হচ্ছে রিয়েল গাধা—এক, যারা চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে, আর এক হচ্ছে—যারা বুঝতেই পারে না, তাদের বউ এতে সত্যি খুশী হবে কিনা। বিশাখা যে এতে খুশী হতেই পারে না—সেটা বুঝতে পারেনি দেবনাথ।

—কিন্তু দেবনাথেরও অবস্থা বেশ সচ্ছলই ছিল।

—তুমি আমার পয়েন্টটাই বুঝতে পারলে না!

আমি দুজনের জন্য খাবার অর্ডার দিলাম, মনুজেশ আর এক বোতল বিয়ার নিল। মনুজেশের কথা শুনে যতই বুঝতে পারছি যে বিশাখা সম্পর্কে এখনও তার দুর্বলতা আছে, এখনও সে বিশাখার কথা তীব্রভাবে ভাবে—ততই আমার মাথায় পরিকল্পনাটা দানা বাঁধছে। আমার মুক্তির উপায় আমি পেয়ে গেছি।

মনুজেশ বললো, তা যাক গে। বিশাখা আমার কথা কি বললো বলো!

—বিশাখার এই বিপদের সময় কি তোমার একটু খোঁজ খবর নেওয়া উচিত ছিল না?

—এটা এমন ধরনের বিপদ যাতে অন্য কেউ সহানুভূতি জানাতে পারে না! কারুর ছেলেপুলে মারা গেলেই সান্ত্বনার ভাষা খুঁজে পাই না আমরা। আর এখানে গিয়ে কি বলবো, আহা, তোমার স্বামী টাকা চুরি করেছে, তাতে আর কি হয়েছে। আফটার অল, এটা একটা সামাজিক অন্যায়, আমরা কেউ এতে সমর্থন জানাতে পারি না।

—সেটা ঠিক। দেবনাথের সঙ্গে আমাদের কোনো রকম সংস্পর্শই রাখা উচিত নয়। কিন্তু তুমি কি বলতে চাও, এজন্য বিশাখাকেও ঘৃণা করতে হবে?

—বিশাখার উচিত এখন কিছুদিন বাপের বাড়ি গিয়ে থাকা!

—বিশাখাকে তুমি চেন না? অসম্মানের বোঝা মাথায় নিয়ে সে অন্য কোথাও যাবে না!

—তুমি বিশাখাকে কি রকম দেখলে বলো! মন-মরা হয়ে আছে?

—ঠিক তার উল্টো। বিশাখা দারুণ হাসি-খুশি, সব সময় হাল্কাভাবে কথা বলছে। কিন্তু এটাই অস্বাভাবিক নয় কি? আমি ঠিক বুঝতে পেরেছি, বিশাখা ভেতরে ভেতরে দারুণ বিষণ্ণ হয়ে আছে। আমার এত কষ্ট হচ্ছিল।

—আমি কি করতে পারি বলো। আমি দেবনাথকে বাঁচাতে পারবো না। বাঁচাবার ক্ষমতা থাকলেও সে চেষ্টা করতুম কিনা সন্দেহ।

—কিন্তু বিশাখা তোমার কথা বলছিল হয়তো তোমাকে দেখলে সে একটু সান্ত্বনা পাবে। ও ভাবছে, সবাই ওকে পরিত্যাগ করতে চায়!

এক চুমুকে গেলাসটা শেষ করে মনুজেশ তাকিয়ে রইলো আমার দিকে। এত সহজে তার নেশা হবার কথা নয়, কিন্তু তার চোখে একটা চকচকে জলের পর্দা। আমার চোখ থেকে চোখ সরাচ্ছে না, যেন আমার ভেতর পর্যন্ত দেখার চেষ্টা করছে। কিংবা তাও নয়, হয়তো আমার দিকে তাকিয়েও আমাকে দেখছেই না। মানুষের মন হঠাৎ নরম হয়ে গেলে, এই রকম দৃষ্টি হয়!

সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে মনুজেশ বললো, না, বিশাখার সঙ্গে দেখা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

—চলো, এবার ওঠা যাক।

—না, আর একটু বসো। আমি আর একটা বিয়ার নেবো। তুমি তা হলে কিছু খাবে না?

—না। তুমি তা হলে একা বসো। আমি এবার উঠি।

—আঃ, একটু বসো না! বিশাখার কথা বলে এমন মন খারাপ করিয়ে দিলে! বিশাখার সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছে করে না কেন জানো! আমার ভয় হয় ওকে দেখলে আমি বোধ হয় নিজেকে সামলাতে পারবো না। তোমাকে একটা সত্যি কথা বলি, এরপর তিনচারজন মেয়ের সঙ্গে প্রেম-প্রেম খেলা খেলেছি, বুকে জড়িয়ে ধরেছি, তবু আমার বুকটা ফাঁকা রয়ে গেছে। মনে হয় বিশাখাকে না পেলে আমার বুকের ঐ শূন্যতা কিছুতেই ভরবে না। আর তো কোনো মেয়ের আঙুল ছুঁয়ে বিদ্যুতের তরঙ্গ পাইনি!

মনুজেশ আরও কিছু বলতে লাগলো উচ্ছ্বাসের কথা। সেসব আর আমার কানে ঢুকলো না, আমি একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেলাম। নিজের ভেতরটা যাচাই করতে লাগলাম তন্ন তন্ন করে। আমার কি রাগ হচ্ছে মনুজেশের কথা শুনে? আমার অভিমানে কি ঘা লাগছে? বিশাখা সম্পর্কে শারীরিক ভাষায় প্রেমের কথা শোনাচ্ছে মনুজেশ, এতে কি আমার আহত হবার কথা? কিন্তু আমার মনটা তো হাল্কাই লাগছে।

আমি হাল্কাভাবেই হেসে বললুম, কোনো মেয়ে সম্পর্কে আমার যদি ওরকম ফিক্সেশন থাকতো, আমি কিছুতেই ন্যাকা প্রেমিকদের মতন সে মেয়ের থেকে দূরে সরে থাকতাম না।

মনুজেশের বোধহয় আঁতে একটু ঘা লাগলো। রীতিমতন চটে উঠে বললো, দ্যাখো, আমি রীতিমতন ভদ্দর লোক! আমি ফেয়ার গেম-এ বিশ্বাস করি। এক সময় দেবনাথের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমি হেরে গিয়েছিলাম। এখন দেবনাথ বিপদে পড়েছে বলেই আমি তার সুযোগ নেবো—আমি সে রকম মানুষ নই!

—দ্যাখো মনুজেশ, তোমার মনটা বড় অপরিচ্ছন্ন! সুযোগ নেবার কথা উঠছে কোত্থেকে? বন্ধুর সঙ্গে বন্ধু দেখা করে না, বিপদের সময়? বিশাখা এক সময় তোমার বন্ধু ছিল—

—কিন্তু ভাই এখন অভ্যেসটাই এমন হয়ে গেছে, শরীর ছাড়া অন্য কোনো রকম সম্পর্ক ভাবা একটু কষ্টকর মেয়েদের সম্পর্কে। এখন কি আর ঘন্টার পর ঘন্টা শুধু মুখোমুখি বসে গল্প করার দিন আছে? শুনেছি পঞ্চাশ বছর বয়েস হয়ে গেলে আবার মানুষ ওতে আনন্দ পায়।

—মনুজেশ আমি এবার উঠবো!

—আরে বোসো না! নিজেই ডেকে আনলে! তুমি তাহলে বলছো, বিশাখার সঙ্গে দেখা করতে?

—আমি কিছুই বলছি না। সেদিন বিশাখার সঙ্গে কথা বলে মনে হলো, ও তোমার কথা এখনো ভাবে।

—কিন্তু দেবনাথ যে আমাকে একদম পছন্দ করে না! বিয়ের পর দু'তিনবার গিয়েছিলাম ওদের বাড়িতে, দেবনাথ এমনভাবে তাকাতো—

—দেবনাথের তাকানো গ্রাহ্য না করলেই হয়। মুখে কিছু বলার সাহস আর দেবনাথের নেই! আমি তো যাই, আমাকে তো কিছু বলে না। আমিও তো বিশাখার বন্ধু ছিলাম।

—হ্যাঁ, তোমার ব্যাপারটা কি বলো তো? বিশাখা সম্পর্কে তোমার একটুও দুর্বলতা নেই?

রেস্তোরাঁর দেয়াল-জোড়া আয়নাতেই তো দেখতে পাচ্ছি, আমার মুখের একটা রেখাও বদলালো না। মনুজেশের হাত চাপড়ে বললাম, নাঃ, সেদিকে তোমার কোনো ভয় নেই। আমার সে রকম কিছু নেই বিশাখা সম্পর্কে।

—কেন নেই?

—এক সময় একটু আধটু ছিল হয়তো। কিন্তু এখন আমি অন্য একটি মেয়েকে ভালবাসি, দু'এক মাসের মধ্যেই তাকে বিয়ে করবো!

—তাই নাকি! কে মেয়েটি, আমরা চিনি?

সেসব কথা পরে হবে! চলো, এবার ওঠা যাক। আমাকে অফিসে ফিরতে হবে!

বাইরে বেরিয়ে আসার পর মনুজেশ বললো, তুমি বিশাখার কথা এমনভাবে মনে করিয়ে দিলে, না গিয়ে আর উপায় নেই। কিন্তু যদি মাথার ঠিক রাখতে না পারি!

আমি ঠাট্টার ভঙ্গিতে বললাম, যদি চাও তো আমি দেবনাথকে সন্ধ্যের পর বাইরে ডেকে এনে তোমায় সুযোগ করে দিতে পারি!

—মনুজেশ সান্যাল ওসব সুযোগের অপেক্ষায় বসে থাকে না! মনুজেশকে ট্যাক্সিতে তুলে দিয়ে আমি একটুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। মনটা আবার আস্তে আস্তে ভারী হয়ে আসতে লাগলো। বেশ তেষ্টাও পাচ্ছে। অফিসে আজ না ফিরলেও খুব ক্ষতি হবে না। আমি আস্তে আস্তে আবার রেস্তোরাঁটায় ফিরে এসে এক বোতল বিয়ারের অর্ডার দিলাম। এসব আমি কদাচিৎ খাই। কিন্তু আজ, সিনেমার ভিলেনদের মতন, আমাকে সামনে মদের গেলাস নিয়ে বসতেই হবে।

আমি বিশাখার কাছে কথা রাখতে পারবো না। তাই পরিকল্পনা করে মনুজেশকে ওর কাছে পাঠিয়ে দিলাম। আমার সাহস নেই, স্পষ্ট সিদ্ধান্ত নেবার মতন মনের জোর পাচ্ছি না। বান্ধবীর স্বামী যদি ঘুষখোর হয়, তবে কিভাবে তাকে সাহায্য করা উচিত একথা আমাকে কেউ বলে দিতে পারে না।

বিশাখা সত্য জানতে চেয়েছিল। কি হবে সত্য জেনে? দেবনাথ যদি সত্যিই ঘুষখোর হয়, তাহলে কি বিশাখার উচিত স্বামীকে ত্যাগ করা? সমাজের নির্দেশ কি তাই? দেবনাথের তো বিচারে ফাঁসী হবে না, বড়জোর দু'তিন বছরের জেল হতে পারে। জেল থেকে সে ফিরে আসবেই—তারপরও সারাজীবন লোকে তার অপরাধের কথা ভুলবে না। আর বিশাখা সেই গ্লানির বোঝা বইবে?

আর বিশাখা যদি দেবনাথকে ছাড়তেও চায়, তার তো আর কোনো আশ্রয় দরকার। কে সে আশ্রয় দেবে? আমি নই! বিশাখার বিয়ের সময় আমারও মন কেমন করেছিল, কিন্তু একজন ঘুষখোর সরকারী অফিসারের

ডিভোর্স করা বউয়ের সঙ্গে আর একজন সরকারী অফিসারের সম্পর্ক থাকা ভালো না! সেটা তার চাকরির সুনামের পক্ষে ক্ষতিকর। আঃ, চাকরি, চাকরি! ভালোবাসা-টালোবাসার চেয়েও চাকরি অনেক বড়।

আমরা সবাই কিছু না কিছু অসৎ, কেউ সমাজের কাছে, কেউ হৃদয়ের কাছে। দেখেছি তো অনেকেরই কিছু না কিছু কথা রাখে না। সবচেয়ে ভালো বিশাখাও যদি একটু অসৎ হয়। মনুজেশের সঙ্গে সেও যদি অন্যায় কোনো ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ে, তারও কিছু গোপন করার মতন ব্যাপার থাকে—তবে সেও আর দেবনাথের অন্যায়টাকে বড় করে দেখবে না। তাই তো নিয়ম! মনুজেশ পারবে না?

বছর পাঁচ সাড়ে পাঁচ আগে, বিশাখার সঙ্গে আমি জিওলজিক্যাল সার্ভে অফিসটার পিছন দিকের বাগানে বেড়াতে গিয়েছিলাম। ভেতরে একটা মস্ত বড় পুকুর—তখন বিকেল শেষ হয়ে গেছে, ভালো করে সন্ধ্যে নামে নি, আকাশটা অনেক নিচু হয়ে নেমে এসেছিলো মন্থর আলোয়—একটা সাদা হাঁস পুকুরটার জল দু'ভাগ করে এগিয়ে আসছিলো আমাদের দিকে। বিশাখা সেই দিকে তাকিয়ে বলেছিলো, ভারী সুন্দর, না? সে সুন্দর কথাটা উচ্চারণ করার জন্যই, সেই দৃশ্যটা সব সময় আমার চোখে ভাসে। স্মৃতি তে সে দিন কার সেই বিকেলের আকাশে কখনও সন্ধ্যে হয় নি। আজ অন্ধকার ঘনিয়ে এলো। আমার মনে হলো, আজ এইমাত্র আমি কি যেন একটা বহুমূল্য জিনিস হারালাম। আমার বুকের মধ্যে দারুণ ব্যথা করতে লাগলো। সবাই ঠিক সময় ভালোবাসার কথা বোঝে না। সেদিন বুঝিনি, এতগুলো বছরেও বুঝিনি, আজ, মনুজেশকে বিদায় দেবার পর আমি বুঝতে পারলাম। আমি শুধু বিশাখাকেই ভালোবাসি। কিন্তু আমি বিশাখাকে চাই না।

—বিশাখা আমাকে জোর করে পাঠালো। আমি আসতে চাইনি।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, যাবো যাবো করেও যাওয়া হয়ে উঠছিল না। আমি খুব সম্ভবত আগামী সপ্তাহেই দিল্লী যাচ্ছি।

—তোমাকে দিল্লী যেতে হবে না।

অস্বস্তিকর অবস্থা। বিকেল বেলা অফিস থেকে বেরিয়েই দেখি বাইরে দাঁড়িয়ে আছে দেবনাথ। আমাদের জয়েন্ট ডাইরেক্টর আমাকে তাঁর গাড়িতে রাসবিহারী মোড় পর্যন্ত লিফট দেবেন বলেছিলেন, তাঁর সঙ্গেই সিঁড়ি দিয়ে

নেমে ছিলাম। দেবনাথকে দেখেই আমি না দেখার ভান করেছি। বলা তো যায় না, দেবনাথের সঙ্গে যদি জয়েন্ট ডাইরেক্টরের কোনো ক্রমে মুখ চেনা থাকে তাহলে তিনি নিশ্চয়ই ওর ব্যাপার সব জানেন। কিন্তু দেবনাথই হাত তুলে আমাকে ডাকলো। আমি সঙ্গে সঙ্গে মনোস্থির করে জয়েন্ট ডাইরেক্টরকে বললাম, স্যার, আমি একটা লাল ফ্ল্যাগ দেওয়া ফাইল টাইপ করতে দিয়ে এসেছিলাম, সেটা সই করে আসিনি। আমি আর একটু অফিসে থাকবো, আপনি চলে যান বরং!

জয়েন্ট ডাইরেক্টর সরু চোখে একবার দেবনাথকে দেখে নিয়ে মৃদু হেসে বললেন, তাড়াতাড়ি সেরে নিও। ইয়ংম্যানদের ছুটির পর বেশীক্ষণ অফিসে থাকা ভালো না, ওতে স্বাস্থ্য টেঁকে না!

এই সপ্তাহ তিনেকের মধ্যেই দেবনাথ আর একটু রোগা হয়েছে। চোখ দুটোর তলায় ঘন কালো দাগ, দৃষ্টি জ্বলজ্বলে। এক মুহূর্তের জন্য যে দেবনাথের ওপর আমার একটু মায়া হলো না, তা নয়! কেন দেবনাথের এই অবস্থা হল? বিশাখার মতন একটি রূপসী মেয়েকে বিয়ে করে ওর কি সুখী হবার অধিকার ছিল না? নিছক বুদ্ধিভ্রমে ওর এই দশা?

প্রথমে আমি ওকে বলতে উদ্যত হয়েছিলাম। কি ব্যাপার, এখানে দাঁড়িয়ে আছো যে? অফিসের ভেতরে এলেই পারতে?

—কিন্তু বলিনি, নিজেকে সামলে নিয়েছি ঠিক সময়ে। সর্বনাশের ব্যাপার হতো তাহলে, সি বি আই-এর রিপোর্টে যাকে সাসপেন্ড করা হয়েছে সে এসেছে অফিসে আমার সঙ্গে দেখা করতে, একথা কেউ না কেউ কি আর জয়েন্ট ডাইরেক্টরের কানে তুলতো না! কান ভারী করার লোকের কি অভাব আছে? আমাকে যে কটেজ ইন্ডাস্ট্রিতে ডেপুটি সেক্রেটারি করে পাঠাবার কথা হচ্ছে, সেটা তাহলে পিছিয়ে যেত না? অথচ দেবনাথ গেলে আমি তাকে তাড়িয়ে দিতে পারতাম কি? হাজার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে বসিয়ে চা খাওয়াতে হতো না! দেবনাথ যে আমার অফিসে ঢোকেনি, এজন্য সে আমাকে কৃতজ্ঞ করেছেই বলা যায়। সুতরাং তার সঙ্গে হাসি মুখেই কথা বলতে হলো।

দেবনাথ কিন্তু আজ আর তেমন নির্জীব নিরুৎসাহ নয়। কোথা থেকে সে যেন একটা নতুন শক্তি পেয়ে গেছে। রীতিমতন জোর দিয়ে সে বললো, তোমাকে আর দিল্লী যেতে হবে না!

আমি একটু হকচকিয়ে গিয়ে বললাম, কেন!

—এই শুক্রবার আমার মামলার তারিখ পড়েছে।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ। এবার আমি তাড়াতাড়ি মামলা চুকিয়ে ফেলতে চাই। আমি কি করবো, আমি ঠিক করে ফেলেছি।

আমি রীতিমতন ভয় পেয়ে গেলাম। সাত আট মাসের মধ্যে দেবনাথের সঙ্গে আমার ঘুরে ফিরে বেশ কয়েকবারই দেখা হয়েছে, কখনো তাকে এমন পরিষ্কার তেজের সঙ্গে কথা বলতে শুনিনি।

—কি ঠিক করে ফেলেছো?

—আমি আমার উকিল ছাড়িয়ে দিচ্ছি। আমি জজের সামনে নিজে দাঁড়িয়ে বলবো, আমি সব অভিযোগ মেনে নিচ্ছি! আমি দোষ স্বীকার করছি।

—কি বলছো কি! তুমি পাগল হয়ে গেছো!

দেবনাথ হাসলো। কি কঠিন ঠান্ডা সেই হাসি। আমার দিকে সোজা তাকিয়ে বললো, তুমি বিশ্বাস করো, আমি নিরপরাধ!

—ইয়ে, মানে, আমার বিশ্বাস করা-না-করায় কি আসে যায়? তোমার যদি সত্যি দোষ না থাকে, আইনের কাছে তুমি নিশ্চয়ই তা হলে ছাড়া পাবে! অ্যাকুইট্যাল হয়ে গেলে তুমি চাকরি তো ফিরে পাবেই, সাসপেনসান পিরিয়াডের সমস্ত মাইনে ফেরৎ পাবে।

—আইন আমাকে বাঁচাবে? আমার কথা কেউ বিশ্বাস করেনি, আমি পেছন ফিরলেই সবাই আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে চোর বলে, এমন কি আমার স্ত্রীও আমায় বিশ্বাস করেনি।

—না, না, বিশাখা মোটেও সে রকম ভাবে না।

—আশা করি আমার স্ত্রীকে আমার চেয়ে তুমি বেশী চেনো না!

এবার আমার প্রস্তুত হবার পালা। আমি সতর্ক ভঙ্গিতে বললাম, ঠিক আছে, তুমি আমার কাছে এসেছো কেন আজ?

হাঁটতে হাঁটতে আমরা লাল দিঘি পেরিয়ে রাজভবনের পাশ দিয়ে চলেছি। রাস্তায় আর কেউ যাতে শুনতে না পায় এই রকম ভাবে ফিসফিসিয়ে দেবনাথ আমাকে বললো, বিশাখা আমাকে জোর করে পাঠালো। তুমি ওর কাছে কি যেন কথা দিয়ে একছিলে, সেটা ভুলে গেছ

কিনা জানতে। বিশাখা তোমাকে দু'দিন অফিসে ফোন করেছিল, পায়নি। একদিন তোমার অফিস থেকে বলেছে তুমি লাঞ্চ খেতে বেরিয়ে গিয়ে আর ফেরো নি—আর একদিন তুমি অন্য কোন্ অফিসারের ঘরে ছিলে—সেখান থেকে তোমাকে ডেকে দেওয়া যাবে না। ওর ধারণা হয়েছে, তুমি বোধ হয় যে-কথা দিয়েছিলে, সেটা রাখতে চাইছো না!

—বিশাখাকে আমি কি কথা দিয়েছিলাম তুমি জানো না?

—জানি। তাই তো তোমাকে বারণ করতে এলাম। আমার আর কারুর কাছ থেকে কোনো সাহায্যের দরকার নেই। আমি আইনের কাছ থেকেও সুবিচার চাই না। আমি সব দোষ স্বীকার করবো!

—তুমি সত্যিই ওসব করেছিলে?

—তোমার জেনে কি লাভ?

নেতাজী মূর্তির কাছাকাছি এসে, রাস্তা পার হবার জন্য আমরা থমতকে দাঁড়িয়েছি। দূরে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের পিছন দিকটায় ডুবে যাচ্ছে সূর্য। আমার হঠাৎ মনে হল দেবনাথ আমার সঙ্গে একটা সাংঘাতিক খেলা খেলছে। জামার হাতা থেকে ও এখনো সব তাস বার করেনি—। আমাকে জানতেই হবে, দেবনাথ সত্যিই ঐ সব অপরাধ করেছিল কি না!

দেবনাথের হাত চেপে ধরে আমি খুব মিনতি করে বললাম, দেবনাথ, কেন এরকম হচ্ছে সব কিছু? বিশ্বাস করো, আমি তোমার বন্ধু। আমাকে তুমি সত্যি কথাটা বলো, আমার দ্বারা যদি কিছুমাত্র সাহায্য করা সম্ভব হয়—

আমি যে মিথ্যে বলেছি, তা সেই মুহূর্তে আমি নিজেই ভুলে গিয়েছিলাম। একথা ঠিক, দেবনাথকে কোনো রকমে সাহায্য করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবু সেই মিথ্যে বলার সময়েও আমার গলায় আন্তরিকতার ছোঁয়া লেগেছিল।

দেবনাথ হাত ছাড়িয়ে নিয়ে অস্বাভাবিক দৃঢ়তার সঙ্গে বললো, হ্যাঁ, আমি ঐ সব অন্যায়গুলো করেছি। করেছি, কারণ ঐগুলো করাই সহজ ছিল। আমি যে পোস্টে কাজ করতাম, সেই পোস্টে অন্যায় না করাই শক্ত। কিছুদিন চাকরি করার পর আমি জানতে পারলাম, আমার বাবাও ঘুষ নিতেন। আমাদের ভবানীপুরের বাড়িটা ঘুষের টাকায় তৈরী।

—দেবনাথ!

—শুনতে তোমার খারাপ লাগছে তো! কিন্তু ব্যাপারটা সত্যি। আমার বাবাও ইনকাম ট্যাক্সের কমিশনার ছিলেন। বৃটিশ আমলে আরও সহজ ছিল। যাক গে, তুমি এখন কোন্ দিকে যাবে?

আমি কোন দিকে যাবো, তা তো আমি নিজেই জানি না। বিশাখার মুখটা চকিতে একবার ভেসে উঠলো চোখের সামনে। বিশাখা সত্যি কথাটা জানতে চেয়েছিল কেন? মুনি ঋষিরা যে কারণে সত্যের সন্ধান পেতে চায়, সেই জন্য? না সামাজিক অপবাদ থেকে মুক্তি পাবার জন্য।

আমি বললাম, দেবনাথ, আমি তোমার কথা বিশ্বাস করি না। তুমি কিছু একটা চালাকি করতে চাইছো।

রেড রোডের ওপর দাঁড়িয়ে দেবনাথ হাসতে লাগলো। তার মুখে রকম হাসি আমি কখনো শুনিনি। দেবনাথ ফিরে পাচ্ছে তার আগেকার চেহারা, আগেকার প্রাণোচ্ছলতা। অথচ এখন তো তার এসব ফিরে পাবার কথা নয়।

—আমাদের বাড়ি যাবে নাকি? বিশাখার সঙ্গে দেখা করে আসবে!

—তুমি ওকে বলেছো যে, তুমি আদালতে সব স্বীকার করতে যাচ্ছো?

—না, ওকে এখনো বলিনি। আজ সকালবেলাই ঠিক করলাম। সেই থেকে আমার মনের ভাব কেটে গেছে। অন্যায় করার মতন অন্যায় স্বীকার করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতেও অনেক দেরী লাগে। অফিসে প্রথম দু'তিন বছর আমিও ভদ্রলোক ছিলাম, কড়া অফিসার হিসেবে আমার নাম ছিল—তারপর আমাকে মাদ্রাজে ট্রান্সফার করার কথা উঠলো, আমি তখনও কারণটা বুঝতে পারিনি।—একদিন একজন বুড়ো কেরানী আমাকে আমার বাবা সম্পর্কে ইঙ্গিত করলো, সে আমার বাবার সঙ্গে বাঙ্গালোরেও চাকরি করেছিল!

—আমি এসব শুনতে চাই না।

—সত্যি তো, তোমাকে এসব শোনাবার কি-ই বা মানে হয়। চলো, আমাদের বাড়িতে চলো, বিশাখার সঙ্গে দেখা করে যাবে। বিশাখার শরীরটা ভালো নেই দু'দিন থেকে।

—কেন, কি হয়েছে ওর।

দেবনাথ আবার হাসতে আরম্ভ করলো। স্ত্রীর অসুখের কথায় হাসির কি আছে? মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি ছেলেটার? অথচ আজই এতদিন বাদে দেবনাথের কথাবার্তা সব সুস্থ ধরনের। তবে আবছা অন্ধকার ময় রেড

রোডে দাঁড়িয়ে নিজের কোন রসিকতায় এমন প্রশান্তভাবে হাসছে ও? ঘুষখোরের ছেলে ঘুষখোর, তার আবার এত আনন্দ কিসের?

আমার আর সহ্য হচ্ছে না। কেন এই জটিলতার মধ্যে আমাকে জাড়ানো! ইচ্ছে হলো, দেবনাথের কাছ থেকে ছুটে পালিয়ে যাই। আমার তো এখন অফিস থেকে বাড়ি ফিরে হাত মুখ ধুয়ে চায়ের কাপ নিয়ে বসার কথা। রেকর্ড প্লেয়ারে চড়ানো থাকবে সেতারের লং প্লিয়িং। বছর দু'এক আগে জয়াকে যদি বিয়ে করতাম তাহলে দৃশ্যটা কমপ্লিট হতো। এইসবের জন্যই তো চাকরি!

রীতিমতন ধমক দিয়ে বললাম, হাসছো কেন? কি হয়েছে বিশাখার?

—হাসবো না? আজ আমার বড় আনন্দের দিন হে! শোনো, বিশাখাকে আমি সব সময় খুব যত্নে রেখেছি। বড় ভালো মেয়ে! নিজের স্ত্রী বলে বলছি না, তুমিও তো জানো! ওকে কখনো কোনো কষ্ট দিইনি। বিশাখা আমাকে ভালোবাসে না জানি, তবুও কোনো কষ্ট দিইনি।

দেবনাথ আমার দিকে উৎসুকভাবে তাকালো। আমি কোনো মন্তব্য করলাম না। ওদের দাম্পত্য ব্যাপার, এতে আমার বলার কি আছে!

দেবনাথ আবার বললো, বিশাখা অবশ্য চেষ্টা করেছিল খুব, কিন্তু পারেনি। ও তো আবার তোমাকেই ভালোবাসে কিনা—

আমি চেঁচিয়ে উঠে বললাম, কি বলছো কি যা তা! বিশাখা আমার ছোটবোনের মতন।

সংকটের সময় মানুষ আপনা আপনি কি রকম মিথ্যে কথা বলে। বিশাখা সম্পর্কে আমার আর যা-ই মনোভাব হোক, আমি ওকে কোনোদিন ছোটবোন হিসেবে মোটেই দেখিনি। সেটা আমার স্বভাব নয়। কিন্তু দেবনাথের ঠান্ডা গলায় ঐ কথাশুনে আমি দারুণ ভয় পেয়ে গেলাম। আমি আবার জোরের সঙ্গে বললাম, বিশাখা আমার ছোটবোনের বন্ধু ছিল, আমারও ছোট বোনের মতন—

—আহা-হা, তোমাকে তো কোনো দোষ দিচ্ছি না! আমার বউ যদি মনে মনে তোমাকে ভালোবাসে, সেটা কি তোমার দোষ? তুমি যে ব্যাপারটাকে কখনো গুরুত্ব দাওনি, তা তো আমি জানিই! বিশাখাকেও দোষ দিতে পারি না। ওরকম মনে মনে খানিকটা ভালোবাসা প্রায় সব মেয়েরই থাকে অন্য কারুর জন্য। ধরো, তোমার সঙ্গেই যদি বিশাখার বিয়ে হতো, তা হলে তখন বোধ হয় আমার প্রতি ওর একটু একটু ভালোবাসা থাকতো!

—দেবনাথ, এ সব আজেবাজে কথা শোনার সময় নেই আমার!

—আরে শোনোই না, সবচেয়ে মজার কথা কি জানো, যেদিন থেকে আমি সাসপেন্ড হলাম, তারপর থেকেই কিন্তু বিশাখা আমাকে খুব ভালোবাসতে লাগলো। কি এর রহস্য জানি না, কিন্তু বিশাখা প্রাণপণে চেষ্টা করতো আমার দুঃখ ভুলিয়ে দিতে। হয়তো তার একটা কারণ এই, বিশাখা গোড়া থেকেই আমার নামে সব অভিযোগগুলো বিশ্বাস করে ফেলেছিল। আর প্রমাণহীন সেই বিশ্বাসের জন্যই অনুশোচনা হয়েছিল ওর—

—দেবনাথ, তুমি কখনো রেস খেলতে?

—রেস? জীবনে একদিনও খেলিনি। হঠাৎ একথা তোমার মনে হলো কেন?

—টাকাগুলো কি করলে তবে?

—কিসের টাকা? আমার সব টাকা আমি স্টেট ব্যাঙ্কের পাটনা ব্রাঞ্চে বিশাখার নামে জমা করে দিয়েছি। তাতে আর কেউ হাত ছোঁয়াতে পারবে না!

টাকাগুলো যে নষ্ট হয়নি, একথা শুনে আমার একটা নিশ্চিত নিঃশ্বাস পড়লো কেন? মনুজেশ মিথ্যে কথা বলেছে! কিন্তু ঐ পাপের টাকা তো নষ্ট হওয়াই উচিত ছিল। তবু, টাকা জিনিসটা এমন, কোথাও সেটা আছে—এটা জানলেই ভাল লাগে! ঘেন্নায় শিউরে ওঠা উচিত ছিল না আমার!

—প্রায় তিয়াত্তর হাজার টাকা জমা রেখেছি বিশাখার নামে। সে টাকা আর আমারও তোলার ক্ষমতা নেই। তোমার কি ধারণা, বিশাখা সে টাকা কখনো ব্যবহার করবে না? আমার টাকা বলে বিলিয়ে দেবে? মেয়েরা তা পারে?

দেবনাথের মাথায় কি ভূত চেপেছে? কিছু একটা শয়তানি পরিকল্পনা নিয়ে সে খেলা করছে। কিন্তু আমি কেন তার মধ্যে! আমার মুক্তি চাই। আমি কাতর ভাবে বললাম, দেবনাথ, আমি এবার বাড়ি যাবো।

—আসল কথাটাই এখনো তোমাকে বলা হয়নি! দিন দু'এক ধরে বিশাখার খুব বমি হচ্ছিল। কাল ডাক্তার বললো, ইউরিন, টেস্টও হয়ে গেছে—বিশাখার ছেলেমেয়ে হবে। সাড়ে তিন মাস চলছে।

—সত্যি?

—হ্যাঁ। কনফার্মড্! এ কথা জানার পরই আমি ঠিক করলাম—কোর্টে গিয়ে সব স্বীকার করবো।

—দেবনাথ! এ কথার মানে কি?

—বুঝতে পারলে না? আমার বাবা আমার কাছে কিছু স্বীকার করে যাননি। কিন্তু আমার ছেলে বা মেয়ে যাই হোক—সে অন্তত বুঝতে পারবে, তার বাবা যাই করে থাকুক—সত্যি কথা বলেছিল।

—সত্যি কথা বললেই কি সবকিছু মিটে যায়? একথা স্বীকার করলে তোমার জেল হবেই। তুমি বিশাখাকে এই অবস্থায় ফেলে জেলে যাবে? তোমার সন্তান যখন জন্মাবে—

—তা হলে আমি কি করবো?

—তুমি কেস চালিয়ে যাও! বিচারে যদি ছাড়া পাও, তবে শুধু শুধু তুমি জেল খাটতে যাবে কেন?

দেবনাথ আবার হাসলো। বললো, আমি ঐ দোষগুলো করেছি জেনেও তুমি আমাকে কেস কনটেস্ট করার পরামর্শ দিচ্ছো? তুমি বলছো, অপরাধ করেও আমার শাস্তি পাওয়া উচিত নয়?

দেবনাথ এমনভাবে প্রশ্নটা রাখলো যে, আমি প্রায় 'না' বলে চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিলুম। আমি নিজে একজন বিবেকবান নাগরিক হয়ে কি করে একজন অপরাধীকে প্রশ্রয় দেবো? কিন্তু দেবনাথের সমস্ত ব্যাপারটাই যেন একটা চক্রান্ত, সে কি এক ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ নিতে চায় বিশাখার বিরুদ্ধে। গর্ভবতী অবস্থায় বিশাখাকে ফেলে গিয়ে সে হাসতে হাসতে জেলে যেতে চাইছে। বাপের বাড়িতে গিয়ে পর্যন্ত বিশাখা মুখ দেখাতে পারবে না। হাসপাতালে সবাই জানবে, নবজাতকের পিতা একজন জেলের কয়েদী।

আমি তীব্র স্বরে জিজ্ঞেস করলুম, এ কথা তুমি বিশাখাকে এখনও বলোনি?

একটা উদাসীন নিঃশ্বাস ফেলে দেবনাথ বললো, বিশাখাকে আর বলে কি হবে। তার শরীর এখন ভাল না। তোমার কি ধারণা, জানলেও বিশাখা আমাকে আটকাবে?

—তুমি নিজের অপরাধের বোঝা বিশাখার ওপরেও চাপিয়ে দিতে চাইছো কেন?

—আমি বিশাখাকে খুব যত্নে রেখেছি এতদিন। প্রত্যেক বছর পুজোর সময় তাকে নিয়ে গেছি রাণীক্ষেত কিংবা উটকামন্ড কিংবা ডালহৌসি। এখন আমার বিপদের সময় সে অংশ নেবে না? নিশ্চয়ই নেবে—বিশাখা সেই রকমই মেয়ে।

—চলো, আমি বিশাখার সঙ্গে দেখা করতে চাই।

—যাবে? আমি জানতাম তুমি যাবে। আগে রাজী হলেই পারতে। তাহলে এতক্ষণ রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বলতে হতো না। বিশাখার সামনে গিয়ে তো এইসব কথাগুলোই আবার বলতে হবে।

একটা ট্যাক্সি ডেকে দু'জনে উঠে বসলাম। আর একটাও কথা বললাম না ওর সঙ্গে। দেবনাথের বাড়ির সামনে ট্যাক্সি থামতেই দেখলাম মনুজেশ ঐ বাড়ি থেকে বেরুচ্ছে। আমাদের দেখেই ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে বললো, সুনীল, ট্যাক্সিটা ছেড়ো না। ইয়ে, দেবনাথবাবু, আপনি ওপরে যান। বিশাখা হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেছে, আমি আর সুনীল গিয়ে একজন ডাক্তার ডেকে আনি—

দেবনাথ বিনা উত্তেজনায় মৃদু হাস্যে বললো, আপনাদের যেতে হবে না। আপনারাও ওপরে আসুন। আমি টেলিফোনে আমাদের চেনা ডাক্তারকে ডেকে আনছি!

বসবার ঘরেই সোফার ওপর অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে বিশাখা। পা দুটো গোটানো, কিন্তু একটা হাত ঝুলছে, কাঁপছে একটু একটু। একজন দাসী তার মাথায় জল ঢেলে দিচ্ছে, ভিজে গেছে কার্পেট। দেবনাথ আমাদের দিকে তাকিয়ে, ক্ষমাপ্রার্থীর ভঙ্গিতে বললো, চিন্তার কিছু নেই। ওর এরকম আগেও দু-একবার হয়েছে। আপনারা বসুন।

টেবিলের ড্রয়ার খুলে দেবনাথ পুরনো কালের সবুজ-রঙা স্মেলিং সল্টের শিশি বার করলো। বিশাখার নাকের কাছে সেটা ধরতেই একটু বাদে জ্ঞান ফিরে এল তার। চোখ মেলে আমাকে দেখেই বিশাখা ধড়মড় করে উঠে বসলো। উদভ্রান্তভাবে ঘরের সবার দিকে পর্যায়ক্রমে তাকালো একবার, মনুজেশের দিকে তার দৃষ্টি দু-এক মুহূর্ত থেমে রইলো। তারপর দাসীকে বললো, ঠিক আছে, সুরোর মা, তুমি এখন যাও!

বিশাখা আমাকে হাতছানি দিয়ে কাছে ডাকলো! প্রথমেই জিজ্ঞেস করলো, সুনীলদা, তুমি খবর নিয়েছিলে?

এক মুহূর্তও দ্বিধা করলাম না। আমি উৎফুল্ল ভাব এনে বললাম, মেসোমশায়ের সঙ্গে দু'দিন আমার ট্রাঙ্ককলে কথা হয়েছে।

—কি?

—ওর কোনো দোষ নেই। সমস্ত অভিযোগ মিথ্যে। খুব সম্ভবত অন্য লোকের সঙ্গে ওকে গুলিয়ে ফেলা হয়েছে। আবার ফ্রেস তদন্ত হবে।

ঘাড় ফেরাতেই দেখি, দেবনাথ আমার দিকে চেয়ে নিঃশব্দে হাসছে। বিশাখাও হাসলো স্বামীর দিকে চেয়ে। তারপর আবার আমাকে জিজ্ঞেস করলো, দু-এক মাসের মধ্যেই তোমার বিয়ে? মনুজেশদার মুখে শুনলাম! কার সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে?

বললেও বলতে পারতাম যে, মনুজেশক আমি ও কথা ঠাট্টা করে বলেছি। বিয়ে করার কথা আমার মনেই পড়ে না। কিন্তু সে কথা বলতে পারলাম না। লজ্জা লজ্জা মুখ করে বললাম, এখনো একেবারে ঠিক হয়নি। কথাবার্তা চলছে। না, মেয়েটিকে তুমি চেনো না।

ঘরের সবারই এখন হাসিমুখ। মানুষের হাসিমুখ দেখতে সত্যি খুব ভাল লাগে। এর জন্য দু'একটা ছোটখাট মিথ্যে বলায় কোনো দোষ নেই।

দেবনাথ আত্মহত্যা করার দেড় বছর পর মনুজেশ একদিন আমার বাড়িতে এলো। মনুজেশ অনেকটা বদলে গেছে, রীতিমতন দায়িত্ববান গম্ভীর ধরনের মানুষ এখন। চিন্তিতভাবে বললো, সোমনাথ বড্ড বাড়াবাড়ি শুরু করেছে। বিশাখার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে একেবারে।

বেশ কিছুদিন আমি কলকাতায় ছিলাম না। আমাকে কটেজ ইন্ডাস্ট্রির ডেপুটি সেক্রেটারি করা হবে, না পুরুলিয়ার এ ডি এম করে পাঠানো হবে—এই নিয়ে টালবাহানা চলছিল। আমিই জোরজার করে জয়েন্ট ডাইরেক্টরকে ধরে চলে গিয়েছিলাম পুরুলিয়া। বেশ শান্তিতে ছিলাম। ছুটিতে মাত্র দশ দিনের জন্য এসেছি, মনুজেশ কি করে খোঁজ পেয়ে গেছে।

যে-শুক্রবার মামলার ডেট ছিল দেবনাথের, তার আগের দিন রাত্তিরে সে আত্মহত্যা করে। আজও আমি দেবনাথের আত্মহত্যার কারণটা ঠিক মতন বুঝতে পারিনি। ও কি নিশ্চিত জানতোই যে ওর শাস্তি হবেই—তাই তার হাত এড়িয়ে গেল? অথবা, নিজের সন্তানকে—জেলখাটা কয়েদীর সন্তান—এই অপবাদ থেকে মুক্তি দিয়ে গেল? কিংবা, বিশাখার কাছে আমি বলেছিলাম, দেবনাথ নির্দোষ—সেটা মিথ্যে প্রমাণ করার জন্যই ও মরে দেখিয়ে দিয়ে গেল? দু-এক বছরের জেল খাটাই বা এমন আর কি! কি এমন অভিমান ছিল তার, যে-জন্য সে আর বাঁচতে চাইলো না? নৈরাশ্য থেকে মরেনি দেবনাথ, সম্পূর্ণ সুস্থ স্বাভাবিক হয়ে উঠেই সে আত্মহত্যা করেছিল। কিন্তু দেবনাথের মৃত্যুর পর আমি আর বিশাখার সঙ্গে দেখা করতে পারি নি। আমি কাপুরুষ।

মনুজেশের মুখেই শুনলাম, খুব সুন্দর ফুটফুটে ছেলে হয়েছে বিশাখার। দেবনাথের ছোট ভাই সোমনাথ প্রথম কিছুদিন বেশ ভাল ব্যবহারই করেছিল ওর সঙ্গে। এখন আবার আস্তে আস্তে বদলে যাচ্ছে। অফিসে বোধ হয় ঘুষ নিতে পারে না সোমনাথ, কিন্তু টাকার লোভ তারও কম নেই। পাটনার ব্যাঙ্কে বিশাখার নামে জমা দেওয়া একগাদা টাকার খোঁজ সে পেয়ে গেছে কি করে—এখন সে সেই টাকারও অংশ চায়। তার দাদা পৈতৃক সম্পত্তিই সরিয়ে রেখেছে বৌদির নামে—এই তাঁর অভিযোগ। নইলে বৌদি প্রকাশ্যে স্বীকার করছে যে ঐ টাকা ঘুষের টাকা!

মনুজেশ বললো, বিশাখা কিছুতেই মনঃস্থির করতে পারছে না। কিন্তু ও যতদিন না রাজী হয়, আমি ওর জন্য অপেক্ষা করতে চাই।

—কি ব্যাপারে?

—আমি বিশাখাকে বিয়ে করতে চাই!

—বাঃ, ভাল কথাই তো। বিশাখার বাবাও তো মারা গেছেন, তাই না?

—হ্যাঁ। ঐটুকু বাচ্চা নিয়ে ওর পক্ষে একা একা থাকা কি সম্ভব?

—তা বিশাখা রাজী হচ্ছে না কেন?

—ঠিক অরাজী নয়, এক একবার রাজী হয়েও পিছিয়ে যাচ্ছে, মনঃস্থির করতে পারছে না আর কি!

—ধরো, বিশাখার সঙ্গে তোমার বিয়ে হলো। তা হলে তুমি ঐ পাটনা ব্যাঙ্কের টাকাটা নিয়ে কি করতে চাও?

মনুজেশ মুখ কুঁচকে বললো, আমি ও টাকা ছুঁতেও চাই না। তবে, দেবনাথ মারা যাবার পর কেস ডিসমিস হয়ে যায়, আসল ব্যাপারটা আর জানা যায়নি। কিন্তু তুমিই তো বিশাখাকে বলেছিলে যে, তোমার মেসোমশায়ের কাছ থেকে জেনেছো, দেবনাথ নির্দোষ ছিল। তা হলে ও টাকাটাও নির্দোষ। ওটা বিশাখার ছেলের জন্যই জমা রাখা উচিত। সোমনাথকে দেবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

আমি মনে মনে হিসেব করে দেখলুম, কলকাতায় আমি আর মাত্র দু'দিন থাকবো। এর মধ্যে আর ওদের ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ার কোন সম্ভাবনাই নেই। কোনো রকমে হালকাভাবে কথা বলে কাটিয়ে দিলেও হয়। মনুজেশটা দারুণ ভাবপ্রবণ দেখছি। একজন বদনামগ্রস্ত লোকের বাচ্চাসমেত বিধবাকে ও বিয়ে করতে চায়! প্যাচপেচে প্রেম বলে একেই। বুঝবে ঠ্যালা। আমার আর কি!

বললাম, তা বটে! সোমনাথের এটা অন্যায় দাবি! সে তো আর কচি ছেলেটি ছিল না যে তার ভাগের টাকা দেবনাথ ঠকিয়ে নেবে!

—তুমি বিশাখাকে একটু বুঝিয়ে বলবে?

—কি?

—এই ইয়ে, মানে ও যাতে সোমনাথের চাপে পড়ে কিছু ছেড়ে না দেয়! ও তো তোমাকে একেবারে দাদার মতন ভক্তি করে!

—আজকাল সব মেয়েরা নিজের দাদাকেও তেমন ভক্তি করে না।

—বিশাখা কিন্তু করে। তোমার কথা উঠলে—

—তুমি প্রায়ই যাও বুঝি ওর কাছে?

—প্রায় রোজ। একা একা থাকে ঐ বাচ্চাটাকে নিয়ে—তা ছাড়া দেখো, বিশাখা ছাড়া অন্য কোনো মেয়েকে বিয়ে করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

—সেদিন, তুমি থাকতে থাকতেই বিশাখা অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল কেন?

—ও কথা থাক। ও কথা আর তুলো না!

—ঠিক আছে। কিন্তু দেবনাথের ছেলেকে তুমি নিজের ছেলের মতন মানুষ করতে পারবে?

—কেন পারবো না? শিশুদের ওপর কোনো দোষ লাগে না।

—দাঁড়াও, আমি পোশাকটা পাল্টে আসছি। আমিও তোমার সঙ্গে বেরুবো।

মনুজেশকে বসিয়ে ভেতরের ঘরে এলাম। কাচা সার্ট প্যান্ট রয়েছে, কিন্তু একটাও পরিষ্কার গেঞ্জি পাচ্ছি না। ঠিক দরকারের সময় যে এগুলো কোথায় যায়! চাকর-বাকর দিয়ে আর কাজ চলে না। নাঃ, এবার একটা বিয়ে করেই ফেলতে হবে। হোম সেক্রেটারি তাঁর ভাগ্নী সম্পর্কে একটা ইঙ্গিত দিয়েছেন। বিয়ে তো মানুষ শেষ পর্যন্ত একটি মেয়েকেই করে, হোম সেক্রেটারির ভাগ্নীই বা মন্দ কি! ওঁর এখনও রিটায়ার করতে তিন বছর দেরী আছে, এর মধ্যে বিয়ে করাই আমার পক্ষে সুবিধাজনক। একবার মফঃস্বলে গেলে আর সহজে কলকাতায় পোস্টিং হয় না—এখন ওরকম কারুর সুপারিশ ছাড়া কলকাতায় ফেরার আর আশা নেই। ভাবতে ভাবতে একটু হাসি পেল আমার। সামান্য চাকরিতে বদলির সুবিধের জন্য আমি বিয়ের কথা ভাবছি? কিন্তু এমন অস্বাভাবিকই বা কি, অনেকে তো টাকার জন্যও বিয়ে করে। ভালবাসার জন্য বিয়ে করে আর ক'জন, বিশেষত তিরিশ বছর বয়েস হয়ে গেলে—মনুজেশের মতন দু' একটি মূর্খ ছাড়া?

বিশাখাকে দেখে একেবারে চোখ ভরে যায়। এখন সত্যিই একটু রোগা হয়েছে, কিন্তু মোমবাতির আলোর মতন রূপ। কোমল চোখ দুটিতে বিষণ্ণতার ছায়া। বাচ্চাটাও দারুণ সুন্দর হয়েছে, বছর খানেক বয়েস, দেবশিশুর মতন মুখশ্রী, দেয়াল ধরে ধরে টলমল করে হাঁটে, মুখভর্তি খলখলে হাসি। বিশাখা আর বাচ্চাটার মুখের দিকে পর পর তাকিয়ে, আমার বুকের ভেতরটা টন্‌টন্‌ করে উঠলো। এ আর কিছু নয়, সুন্দর জিনিস দেখার বেদনা। মনুজেশ এই গোটা সুন্দর দৃশ্যটাই আয়ত্ত করতে চায়, বুঝতে পারলুম। আমার পক্ষে দূর থেকে দেখাই যথেষ্ট। বেচারা দেবনাথ, ওর জন্যও মায়া হলো আমার, ও এই সুন্দর দৃশ্যটি একটুও ভোগ করতে পারলো না—চলে গেল কোথায় কোন অন্ধকারে।

খানিকটা অভিমান মেশানো গলায় বিশাখা বললো, কেমন আছো?

—ভাল আছি।

তারপরেই, মনুজেশকে চমকে দিয়ে আমি আবার বললাম, এবার কিন্তু আমি তোমার কাছে প্রার্থী হয়ে এসেছি।

ফ্যাকাশেভাবে হেসে বিশাখা বললো, আমার কাছে? আমার কাছে কি চাইবে তুমি?

বিশাখার চোখে নিবিড় কৌতূহল। সেদিকে আমার দু' চোখ নিবদ্ধ রেখে আমি বললাম, পুরুলিয়াতে সরকারী উদ্যোগে আমরা একটা উন্মাদ আশ্রম খুলছি। যে-সমস্ত পাগলকে তাড়িয়ে দেয় আত্মীয়স্বজনরা, যাদের কেউ দেখবার নেই—তাদের চিকিৎসার জন্য। টাকার জন্য কাজ আটকে আছে। জনসাধারণের কাছ থেকেও সাহায্য নেওয়া হচ্ছে, অনেক জমি কিংবা টাকা দিয়ে সাহায্যও করেছে। তোমার তো পাটনার ব্যাঙ্কে অনেকগুলো টাকা আছে, তুমি তা এখানে দিয়ে দাও না!

মনুজেশ সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো, ওর ছেলের ভবিষ্যতের জন্য লাগবে না?

আমি মনুজেশের দিকে ফিরে বললুম, আজকালকার ছেলেদের জন্য বিষয় সম্পত্তি রাখতে নেই। নিজের পায়ে দাঁড়ানোই ভাল। আর ওর লেখাপড়ার খরচ চালাবার উপায় নিশ্চয়ই আছে?

মনুজেশ এবারও সঙ্গে সঙ্গে বললো, তা আছে!

বিশাখার দিকে ফিরে, আবার তার চোখে চোখ রেখে বললুম, আত্মা বলে যদি কিছু থাকে, তা হলে দেবনাথের আত্মা নিশ্চয়ই এতে খুশীই হবে।

বুদ্ধিমতী মেয়ে বিশাখা, বুঝতে ওর দেরী হলো না। এক মুহূর্তও দ্বিধা না করে বললো, ঠিক আছে আমি এক্ষুনি চেক লিখে দিচ্ছি। কার নামে চেক লিখতে হবে?

—লেখো, ডি এম অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার, পুরুলিয়া মেন্টাল হোম স্কিম।

মনুজেশ বললো, এক হিসেবে এই-ই ভাল হলো। ও টাকা সোমনাথকে দেবার কোনো মানে ছিল না।

ঘরের মধ্যে যেন একটা টাটকা তাজা হাওয়া খেলে গেল। বিশাখা লঘু পায়ে উঠে গেল চা করতে। আমি ওর ছেলেটাকে আদর করতে লাগলুম। পর্দার কাপড়ের রং না মিললে নিউ মার্কেটে ছুটতো বিশাখা, দুর্লভ পারফিউম সংগ্রহ করা ছিল ওর শখ—সেই বিশাখা এখন নির্মোহ হতে পেরেছে।

চা নিয়ে ফিরে এসে বিশাখা একটু হালকাভাবে বললো, শুধু এই চাইতে এসেছো? আর কিছু চাইবে না?

—হ্যাঁ, আর একটা আছে। এবার সত্যি সত্যি আমি বিয়ে করছি, মাস তিনেকের মধ্যে।

—কাকে? চেনাশুনো কেউ?

—না, আমাদের হোম সেক্রেটারির ভাগ্নী। মেয়েটি এম এ পাশ—সেই বিয়েতে তোমায় যেতে হবে। শুনেছি, এখনও তুমি বাড়ি থেকে বেরোও না....আমার বিয়েতে তোমাকে যেতেই হবে।

—যাবো, নিশ্চয়ই যাবো! আমার বিয়ের সময় তুমি পিঁড়ি ধরেছিলে, মনে আছে?

—আমার সব মনে আছে।

—সব?

—হ্যাঁ, জিওলজিক্যাল সার্ভে অফিসের পেছন দিকের পুকুরে বসে সেই সাদা হাঁস দেখা পর্যন্ত!

—সেটা কবে বলো তো?

—সেটা তোমার মনে নেই তো? সেই দিনটাই আমার বেশী মনে আছে।

বিশাখার মুখটা একটু উদাস হয়ে গেল। অন্যমনস্কভাবে ছেলের মাথার চুলে হাত বুলিয়ে আদর করতে লাগলো।

আমি বললাম, আমার বিয়ের আগে, আর একটা বিয়ের ঘটকালি করে যাবো নাকি?

বিশাখা আর মনুজেশ পরস্পরের চোখের দিকে একবার তাকালো। তারপর বিশাখা শুকনো গলায় বললো, না, এখন না, আর কিছুদিন পরে।
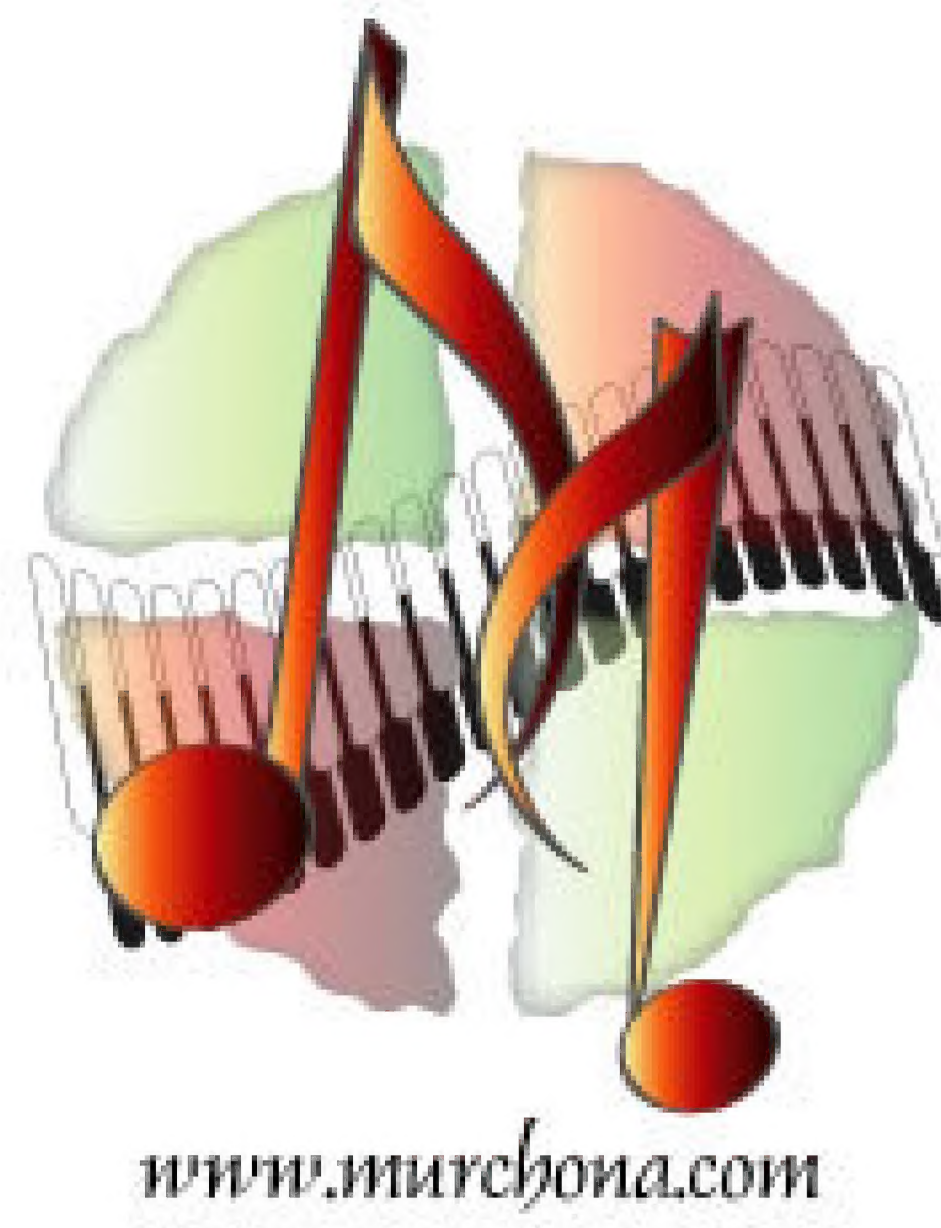
মনুজেশও বললো, হ্যাঁ, আর কিছুদিন যাক।

আমি বললাম, মনুজেশ তুমি তা হলে বসো। আমি এবার উঠি। আমার একটা কাজ আছে।

সিঁড়ি পর্যন্ত আমাকে এগিয়ে দিতে এলো বিশাখা। সিঁড়ির রেলিং-এ আমার হাতের ওপর হাত রাখলো। আরও দুদিন এ রকম হাত রেখেছিল, ওর বিয়ের দিন, আর যেদিন দেবনাথ সম্পর্কে খোঁজ নেবার জন্য আমাকে অনুরোধ জানিয়েছিল। ওর হাতে সামান্য চাপ দিয়ে আমি নেমে এলাম।

দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসার আগে আর একবার পেছন ফিরে দেখলাম, তখনও বিশাখা দাঁড়িয়ে আছে সিঁড়ির ওপর। চওড়া কালো পাড়ের শাড়ি পরা সেই অপরূপ মূর্তিকে আমি আর একবার দেখে নিলাম ভাল করে। তারপর বাইরে বেরিয়ে এলাম।

মনে মনে বললাম, বিশাখা, তুমি আর আমাকে কখনো ডাকবো না, আর আমাকে তোমার প্রয়োজন হবে না। আমি তোমার কাছে একটা কথাও রাখিনি। একটাও মনের কথা বলিনি। কিন্তু বিশাখা, আমি তোমাকেই ভালবাসি। জীবনে দেরী করে যে ভালবাসার কথা বোঝা যায়, সে ভালবাসায় কিছুই পাওয়া যায় না, কিন্তু সারা জীবনে তা আর ভোলাও যায় না।